বাবু
ইংরেজ কোম্পানীর বাংলা
দখলের কিছু পরে আর
নন্দকুমারের ফাঁসি হওয়ার
কিছু আগে, নিমকের
দেওয়ানিতে এক শ্রেণীর
মানুষ ধনী হয়ে উঠেছিল
রাতারাতি। পাঁচ বছরে বিশ
লক্ষ টাকা জমিয়ে মারা
যাওয়ার পর তাঁদেরই বংশে
জন্ম নিল কলকাতার বাবু
সমাজ। সেই বহুরূপী বাবু
সমাজের উদ্ভব ও উত্থানের
ঐতিহাসিক পর্যালোচনাই এ
বইটির বিষয়।
ক্ষণ প্রব
গের গল্প ও
ন্যাস
জীবনানন্দ
৩, ৪ খণ্ড
না দেবেশ রায়
ন চট্টোপাধ্যায়
আরব গেরিলাদের
ন করি
কর
াস
রায়ের ছোটগল্প
পন চট্টোপাধ্যায়ের
গল্প
শ রায়ের ছোটগল্প
য়াভ লেম
শ ও মৃগয়া
: মানবেন্দ্র
পাধ্যায়

বাবু

অবন্তীকুমার সান্যাল

বাবু

প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৮৭

প্রকাশক
প্রিয়ব্রত দেব
প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড
৭ জহরলাল নেহেরু রোড
কলিকাতা-১৩

মুদ্রক
তিমির প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১ চাঁদনি এ্যাপ্রোচ
কলিকাতা-৭২

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী
অঙ্গসজ্জায় সহযোগী
অনিত বোস

দশ টাকা

অশোক সেন
প্রীতিভাজনেষু

কলকাতার সেন্টার ফর সোসাল সায়েন্স-এর আনুকূল্যে কিছুদিন আগে আমি ঊনবিংশ শতাব্দীর 'বাবু' সম্পর্কে গবেষণায় মন দিয়েছিলাম। 'বাবু' নামক চরিত্রটি আজ প্রায় দেড়শো বছরেরও বেশি নকশা-প্রহসন ইত্যাদির বিষয়বস্তুরূপে আমাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-হাসির খোরাক জুগিয়ে এসেছে। সাম্প্রতিক কালে ঊনবিংশ শতাব্দী এবং, বিশেষ করে, কলকাতা সংক্রান্ত প্রবল কৌতূহল জাগ্রত হওগায় অনুসন্ধিৎসুর কাছে 'বাবু' নতুন করে আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠেছে। কিন্তু নকশা-প্রহসনের গণ্ডি ছাড়ালেও বাবু আজও রম্যরচনার চৌহদ্দি ডিঙোতে পারে নি ; আজ পর্যন্ত কেউ তাকে গুরুতর গবেষণার বিষয় বলে গণ্য করে নি। অথচ আধুনিক বাঙালী চরিত্রের ও মানসিকতার বিকাশ ও গঠনের আলোচনা প্রসঙ্গে হামেশাই 'বাবু-সংস্কৃতি', 'বাবু-বৃত্তান্ত' ইত্যাদি ধোঁয়াটে শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমার উদ্যম ছিল 'বাবু' নামক চরিত্রটির ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিচয় উদ্ধার করে, তার কুলুজি যথাসাধ্য সুনির্দিষ্ট করা। 'বাবুর বংশবিচার' সেই উদ্যমের ফল আংশিক খসড়া-প্রবন্ধ (monograph) মাত্র।
খসড়া-প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল 'এক্ষণ' পত্রিকার ১৩৮৩ সালের শারদীয়া সংখ্যায়। খসড়াটিকে সম্পূর্ণ করে গ্রন্থাকারে রূপ দেবার অভিপ্রায় ছিল উদ্যমের প্রথম থেকেই, কিন্তু দীর্ঘ কালেও তা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি নানাবিধ কারণে। অভিপ্রায়টি অবশ্য আজও অক্ষুণ্ণই আছে। খসড়াটিতে কোনো রকম পরিবর্তন বা পরিমার্জন করা হয় নি, কারণ তা করার প্রয়োজন বোধ করি নি। ঐতিহাসিক ও সামাজিক সূত্রগুলো অপরিবর্তিতই আছে এবং অভিপ্রেত গ্রন্থেও থাকবে, কেবল তথ্যের বিচিত্র সমাবেশ ঘটবে।
'বাবু' শব্দটির ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে নিঃসংশয় হবার জন্যে অসুস্থ সুনীতিবাবুকে অবিবেচকের মতো পত্র লিখেছিলাম তাঁর অভিমতের জন্যে ; তবু স্নেহবশে সচিব অনিল কাঞ্জিলালের মাধ্যমে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন দেখা করতে। 'নাম বিচার' অংশটুকু তাঁকে পড়িয়ে শোনালে তিনি শব্দটির ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে আমার অভিমত অনুমোদন করেছিলেন। কিন্তু তার কোনো লিখিত প্রমাণ নেই। অন্তত, একমাত্র সাক্ষী তাঁর সচিব অনিলবাবুর কাছ থেকে লিখিয়ে নেবার বুদ্ধিটাও তখন মাথায় আসে নি, পরেও না ; আজ আসতেই মনে পড়ছে তিনিও গত হয়েছে সম্প্রতি, অথচ কত অপরাহ্ণই না কেটেছে তাঁর সাহচর্যে।
'বাবুর বংশবিচার' প্রবন্ধটি 'বাবু' শিরোনামে পুস্তিকাকারে প্রকাশের জন্যে আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র স্বপ্না দেব, প্রিয়ব্রত দেব এবং বন্ধুবর পূর্ণেন্দু পত্রী।

অবন্তীকুমার সান্যাল

সি-এ ২২৩ সল্টলেক সিটি
কলকাতা-৬৪

১· নামবিচার

'বাবু' শব্দটি সমস্ত আধুনিক ভারতীয় ভাষাতেই আছে, সর্বত্র অর্থেরও মোটামুটি মিল আছে। শব্দটি সংস্কৃতমূল[১] হওয়াই স্বাভাবিক। সংস্কৃত 'বপ্র' বা 'বপ্তা'-জাত 'বাপ' বা 'বাপা' শব্দদুটির ধারাবাহিক বিবর্তনগত মৌলিক অর্থপ্রয়োগের সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে। 'বাপ' বা 'বাপা' থেকে 'বাপু' শব্দের হিন্দি ও বাংলায় তো বটেই, অন্য ভাষাতেও মৌলিক ও সম্প্রসারিত—পিতা, সন্তান, মান্য, সম্ভ্রান্ত অর্থে প্রয়োগ যথেষ্ট পুরনো। 'বাপ' ও 'বাপা'-র সঙ্গে ফার্সি 'বাবা' শব্দের অর্থ ও ধ্বনির অতিনৈকট্য 'াকায় শব্দ তিনটির পারস্পরিক মিশ্রণ ঘটাই স্বাভাবিক; তাছাড়া 'প' 'ব' হওয়া ধ্বনি-বিজ্ঞানের নিয়মবহির্ভূত নয়। 'বাপু' থেকে 'বাবু' শব্দের সৃষ্টি এবং এই 'বাবু' মুসলমান যুগে উর্দু শব্দভাণ্ডারে গৃহীত হয়। শব্দটি ফার্সিমূল নয়।[২] মৌলিক অর্থ ও সম্প্রসারিত অর্থে বাবু শব্দের প্রয়োগও মোটেই অল্প দিনের নয়।[৩] বপ্র> বাবু এবং ইংরেজি Sire> Sir শব্দের মৌলিক ও সম্প্রসারিত অর্থে প্রয়োগের ধারাবাহিকতার মিল আছে।[৪] এই তদ্ভব 'বাবু' শব্দটি কালক্রমে অন্যান্য অভারতীয় আর্য ভাষায় প্রবেশ লাভ করেছে।[৫] ভারতীয় ভাষাগুলোর মধ্যে বাংলাতেই বাবু শব্দের সম্প্রসারিত-সংকুচিত-সংশ্লিষ্ট অর্থ সবচেয়ে বেশি, বাবু-র অর্থগত প্রায় ১৩/১৪ রকম প্রয়োগ অভিধানভুক্ত। এদের বেশির ভাগ অর্থের উদ্ভব কেবল বাংলাদেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্র থেকে ; সম্প্রসারিত বিচিত্র অর্থের সূত্রপাত আঠারো শতকে ইংরেজ আগমনের পর মুখ্যত কলকাতা ও তৎপার্শ্ববর্তী ভাগীরথী অঞ্চলের ইয়োরোপীয় বণিক সম্পর্কিত স্থানগুলো থেকে। এদের ক্রমশ ব্যাপক ব্যবহার আঠারো শতকের প্রায় শেষ পাদ থেকে।

মর্যাদাসূচক বাবু শব্দের প্রচলন আঠারো শতকের অনেক আগের। মুসলমান আমলের রাজসভা ও তৎসংক্রান্ত সামাজিক পরিবেশে শব্দটির প্রচলন অনুমান করা যুক্তিসংগতই মনে হয়। 'হিন্দি শব্দসাগর' অনুসারে বাবু 'রাজার নিম্নে রাজবন্ধুবান্ধব বা রাজন্যদের প্রতি প্রযোজ্য শব্দ'। কারো কারো মতে বাবু উপাধিরূপে দেওয়া হতো।[৬] বাদশাহী বিধিসম্মত তালিকায় বাবু নামে কোনো সরকারী খেতাবের সন্ধান মেলে না।৭ তবু বাবু শব্দ যে প্রায় সরকারী খেতাবের অনুরূপই ছিল তাতে সন্দেহ করা বোধ হয় অনুচিত। মনে হয় বাবুর প্রয়োগ

বেসরকারী সামাজিক ও লৌকিক জীবন থেকে। সাধারণ সম্ভ্রান্ত অর্থ থেকে বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত অর্থে ব্যক্তিবিশেষ সমাজজীবনে বাবু অভিহিত হতো। এর ব্যবহার ছিল নিঃসন্দেহে সীমাবদ্ধ এবং রাজকার্য বা ভূস্বামীত্বের সঙ্গে যুক্ত। হিন্দি অভিধানে বাবুর এক অর্থ 'ক্ষত্রিয় জমিদার', জমিদার অর্থে বাংলাদেশে বাবু শব্দ সুপরিচিত। লৌকিক হলেও বাবু উপাধি পদমর্যাদা (status) বুঝিয়েও একটি বিশেষ পদ (rank) বোঝাতো। বাবু শব্দের পরিবেশ ও পরিমণ্ডল ছিল সম্ভবত অমুসলমান। কোনো মুসলমান কখনো বাবু আখ্যাত হয়েছে এমন নজির নেই। শব্দটি যে ফার্সিমূল নয় এটি তার অন্যতম প্রমাণ বলে গণ্য করা চলে।

বাবু শব্দের অর্থগৌরব যে অনেক আগেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রমাণ ব্যক্তিনামে বাবুর অনুপ্রবেশ। বিশেষ গুণ মর্যাদা ও তাৎপর্য ছাড়া ব্যক্তিনাম হিশেবে কোনো শব্দ ব্যবহার হয় না। আঠারো শতকের একেবারে শেষ পাদের আগে পর্যন্ত বাংলাদেশে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাবু-উপাধি দুর্লভ। কিন্তু ব্যক্তির নাম হিশেবে বাবু শব্দের ব্যবহার বেশ চোখে পড়ে। বর্ধমান জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠাতা আবু রায়ের পুত্রের নাম ছিল বাবু রায়, আবু রায় জমিদারি কিনেছিলেন পলাশী যুদ্ধের প্রায় একশো বছর আগে। ১৭৬৬ সালে রাধাচরণ মিত্রের ফাঁসি-মকুবের আবেদনে ইংরেজ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার বণিক, বেনিয়ান ও কলকাতার বিশিষ্ট যে ৯৫ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন বাঙালীর নাম বাবুরাম পালিত।[৮] গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যেরও আগে উনিশ শতকের গোড়ায় প্রথম যে এদেশীয় ব্যক্তি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেছিলেন তাঁর নাম ছিল বাবুরাম।[৯] টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর বাবুরামবাবু বয়সের হিশেবে আঠারো শতকের শেষ দিকের লোক। মল্লিক পরিবারের বংশতালিকায় শুকদেব মল্লিকের এক পুত্রের নাম দেখা যায় বাবুরাম।[১০]

জমিদারি সংক্রান্ত ব্যবহারে 'বাবু' যে এক ধরনের পদ এবং এই পদ-ব্যবহারের রীতি যে বাংলাদেশের বাইরে প্রচলিত ছিল তার সপক্ষে বাংলাদেশের বাইরের এবং বর্ধমানের জমিদারি কাজকর্মে ও একাধিক অবাঙালী ধনাঢ্য, এমন কি বাঙালী জমিদার পরিবারের মধ্যেও নাম-পদবিতে শব্দটির ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশে নামের পরে লিখিতভাবে বাবু শব্দ যোগ অনেক পরের ঘটনা। কিন্তু বর্ধমান জমিদারির কিছু কিছু কর্মচারী 'বাবু' নামে আখ্যাত হতেন প্রথম থেকেই। ১৭৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে রাজা তিলকচাঁদ কোম্পানির কাউন্সিলের কাছে স্বয়ং লিখে জানাচ্ছেন যে, দেওয়ান মানিকচাঁদ, রামবাবু, লালা উমীরচাঁদ, হরিকৃষ্ণ রায় এবং হরু (হারু ?) বোস মজুমদার তাঁর কর্মচারী ছিলেন, যাঁদের কোনো না কোনো সময়ে তিনি বরখাস্ত করেছিলেন।[১১] রাজা তিলকচাঁদের পক্ষে

সৌজন্যসূচক 'রামবাবু' উল্লেখ এক্ষেত্রে কষ্টকল্পনা। এইভাবে বাবুযুক্ত হয়েই বর্ধমানের রাজকর্মচারী হিরুবাবু, বসন্তবাবু, এমনকি পরানচন্দ্রবাবু বা পরানবাবু উনিশ শতকের গোড়ার দিকেই (১৮১৯) উল্লিখিত হয়েছেন।[১২] জগৎশেঠ পরিবারের 'জগৎশেঠ' ছিল বাদশাহী খেতাব, কিন্তু এই পরিবারের পরবর্তী কালে নামের আগে শেঠ উপাধি রীতি ছিল। ১৭৬৫ সালে নিহত জগৎশেঠের দুই পুত্র শেঠ উদয়চাঁদ ও কুশলচাঁদ ক্লাইভের কাছে এক পত্রে তাঁদের অপর দুই ছোট ভাইয়ের পরিচয় দিয়েছে—একজনকে শেঠ গোলোকচাঁদ, অপর জনকে 'বাবু মেহেরচাঁদ' বলে।[১৩] পদ হিসেবে রাজার সঙ্গে বাবুর উল্লেখ পাওয়া যায় ১৭৮১ সালে বেনারসের কমাণ্ডান্ট দুধ সিং-এর স্বীকারোক্তিতে[১৪]; বেনারসের রাজা উদিতনারায়ণের ভাই উল্লিখিত হয়েছেন 'বাবু দীপনারায়ণ' নামে।[১৫] বাঙালী জমিদার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ পরিচিত ছিলেন 'লালাবাবু' নামে এবং গঙ্গাগোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র উল্লিখিত হতেন 'শ্রীযুক্ত দেওয়ান বিজয়গোবিন্দ সিংহ বাবুজী' নামে।[১৬]

আঠারো শতকের শেষভাগের আগে পর্যন্ত নামের আগে বা পরে মর্যাদাসূচক বাবু শব্দপ্রয়োগ চোখে পড়ে না। কোম্পানির নথিপত্রে এদেশীয় কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির নামের আগে সরকারীভাবে বাবু শব্দ যোগের নজির মেলে না। এমন কি দিল্লিশ্বরের প্রদত্ত রাজা ও রাজাবাহাদুর খেতাব পাওয়ার পরও নবকৃষ্ণকে 'মুন্সি' বলেই অভিহিত হতে দেখি।[১৭] একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় কান্ত মুদি বা পোদ্দার। হেস্টিংসের বিচারের সময় বার্ক উল্লেখ করেছেন 'কান্তবাবু'র (Conta Bah-Booh)। ১৭৮২ সালে মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষে ২০০ সিক্কা টাকা দান করেছেন বলে কান্তবাবু-র (Cantoo Baboo) নামোল্লেখ দেখা যায় ১৭৯১ সালের ইণ্ডিয়া গেজেটে।[১৮]

সরকারীভাবে প্রযুক্ত না হলেও আঠারো শতকের শেষদিকে কলকাতার ধনী বিষয়ী, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় 'অসাধারণ ভাগ্যবান লোকেরা'[১৯], সমাজজীবনে অবশ্যই 'বাবু' আখ্যা লাভ করতেন। সাধারণ মানুষ সম্বোধন বা পরিচয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের নামের আগে বা পরে অবশ্যই বাবু যোগ করত। তাঁরা নিজেরাও সামাজিক ক্ষেত্রে বাবু নামে অভিহিত হতেন। বাবু ছিল বিশিষ্টার্থক।[২০] কিন্তু বাবু শব্দ এই সময়েই সম্প্রসারিত হতে শুরু করেছিল অন্য আর এক দিক থেকে। আঠারো শতকের শেষে, এমন কি উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত সরকারী কাজে বাঙালী রাইটার বা কেরানি নিয়োগ বিরল ছিল।[২১] কিন্তু বেসরকারী বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানে, সাহেবের গদি বা হৌসে, অ্যাটর্নি অফিসে বাঙালী কেরানির অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। দুর্গাচরণ মুখার্জি, হিদারাম ব্যানার্জি, রঘুনাথ ব্যানার্জি বা নিমু মল্লিকের মতো বেনিয়ানরা তো বটেই[২২], অ্যাটর্নি হিকির রামরতন চক্রবর্তী বা শেরিফ অফিসের রামমোহন মজুমদারের মতো 'ভদ্র ও

বিশ্বস্ত' দক্ষ কেরানিরাও বাবু নামে আখ্যাত হতেন।[২৩] পরবর্তী কালে কেরানি অর্থে বাবুর একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। সরকারী ও বাণিজ্যিক পরিবেশে বাবু বললেই কেরানি বোঝাতো, সামাজিক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র শ্রেণী নির্দেশের জন্যে 'কেরানিবাবু' বলা হতো। ক্রমশ বাঙালী কেরানির সংখ্যাধিক্যের জন্যে বিদেশী ও সাহেবদের কাছে 'বাবু' অর্থে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু সমার্থক হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া বাবু হাজারীমল, বাবু কাশীনাথ প্রভৃতি অবাঙালী ধনাঢ্যের নাম চোখে পড়লেও বেনিয়ান-দেওয়ান-মুৎসুদ্দি বাঙালী ধনাঢ্যের সঙ্গে বাবু শব্দ অবিচ্ছেদ্য ছিল। ১৮২৪ সালে বিশপ হেবর যখন গঙ্গার ধারে 'ধনী বাবুদের বাড়ি'র উল্লেখ করেছেন [২৪], তখন 'ধনী বাঙালীদের বাড়ি' বোঝাতেই চেয়েছেন।

আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে ইংরেজি সংবাদপত্রে Mr.-এর বিকল্প হিশেবে এদেশীয় সম্ভ্রান্তদের নামের আগে নিয়মিত বাবু শব্দ যোগ হতে থাকে।[২৫] এটি নিশ্চয়ই সামাজিক প্রচলিত রীতি ছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে বাংলা সংবাদপত্রে এই রীতিই বিধিবদ্ধ রূপে অতি সতর্কভাবে অনুসৃত হয়েছে। নামের আগে সম্ভ্রমাত্মক 'শ্রী, শ্রীযুক্ত, শ্রীযুত' ব্যবহার বাংলাদেশের প্রাচীন রীতি। আনুমানিক ১৬৫২ থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবেশের প্রায় সাড়ে ছয়শো চিঠিপত্রের সংকলনের মধ্যে নামের আগে কোথাও বাবু শব্দের প্রয়োগ চোখে পড়ে না।[২৬] বিভিন্ন বৃত্তির অসংখ্য উল্লিখিত ব্যক্তির কারো নামের পরে বাবু শব্দ যুক্ত হয় নি। ব্যতিক্রম হিশেবে কেবল জমিসংক্রান্ত ব্যাপারে ১৮১৫, ১৮২৯, ও ১৮৩০ সালের দিকের তিনটি চিঠিতে 'রামচন্দ্রবাবু', 'জগমোহন সিংহবাবু' ও 'নিলমোহন সিংহবাবু'র নাম পাওয়া যায়।[২৭] বাবু অর্থে এই তিন জনকেই জমিদার বলে মনে করতে কোনো বাধা আছে বলে মনে হয় না। ১৮২৪ সালের একটি চিঠিতে 'শ্রীযুক্ত বাবু কাশীনাথ রায়' ও 'শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র রায়ে'র নাম উল্লেখ পাই।[২৮] এই বাবুরা তালুকদার। বাংলা সংবাদপত্রে নামের আগে বহু ক্ষেত্রে শুধু বাবু এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত/যুত বাবু ব্যবহার আদ্যন্ত। বাবু রাধাকান্ত দেব, বাবু রামমোহন রায় উল্লিখিত হলেও সর্বত্র উল্লেখ শ্রীযুক্ত/যুত বাবুর। প্রাচীন শ্রীযুক্ত/যুত বাবু শব্দের প্রয়োগে সংবাদপত্রগুলোর সতর্কতাও চোখে পড়ে। সমকালীন ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বাবু অভিধায় নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত। প্রাচীন সম্ভ্রমাত্মক শ্রীযুক্ত/যুত সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে নৈয়ায়িক, বৈয়াকরণ, ভট্টাচার্য ইত্যাদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ক্ষেত্রে। বাবু-পদবাচ্য ব্যক্তিদের প্রথম দিকে অত্যন্ত সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে মাত্র শ্রীযুত-ভূষিত হতে দেখা যায়। মনে হয়, Gentry বোঝাতে Esquire শব্দের মতোই, বিশেষ মর্যাদা বোঝাতে বাবু শব্দ ছিল অপরিহার্য এবং প্রাচীন রীতির শ্রীযুক্ত/যুতের সঙ্গে বাবু শব্দ যোগ করে প্রাচীন ও আধুনিকের একটি নতুন মর্যাদাবোধক

আপসের রীতি গড়ে উঠেছিল।[২৯] পদমর্যাদার ক্ষেত্রে অপরিহার্য বাবুর প্রয়োগ যে কতদূর বিধিবদ্ধ হয়েছিল তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সম্ভবত 'পাথরঘাটানিবাসী' বাবু রমানাথ ঠাকুরের মৃত্যু সংবাদটি (সমাচার দর্পণ, ৮ নভেম্বর, ১৮২৮), সংবাদটির শিরোনামা 'বাবু রমানাথ ঠাকুর বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যের পরলোকগমন'। সংবাদে এইভাবে তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে : 'রামহরি ঠাকুরের পুত্র যিনি আপন ক্ষমতাতে বহুধন উপার্জ্জন করিয়া বহুবিধ দান করত এবং কুলকর্ম্ম করণপূর্ব্বক এই মহানগর মধ্যে গোষ্ঠীপতিত্ব পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন··· ইঁহার বিদ্যা সৌজন্যাদি যত কীর্ত্তি তাহা অনেকেই বিদিত আছেন··· এমত লোক সংপ্রতি সম্ভবে না কেননা বাবু বিষয়ী লোকের নিকট বাবু ছিলেন সভায় বসিলে গোষ্ঠীপতি ঠাকুর হইতেন পণ্ডিতগণের সন্নিধানে বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য খ্যাত ছিলেন··· বাবু বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য তিন সংসার করিয়াছিলেন···'।[৩০] এ ধরনের কোনো দ্বিতীয় নজির নেই। বাংলা সংবাদপত্রগুলোর নিয়মিত প্রয়োগে এই রীতি শিক্ষিত বাঙালীর কাছে শিষ্ট রীতি বলে গৃহীত হয়েছিল। মর্যাদাবোধক বাবু শব্দ ব্যবহারের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাংলা সংবাদপত্রের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।[৩১]

ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের ক্রমবিস্তারের সঙ্গে বিশিষ্ট মর্যাদাবোধক বাবু শব্দ ক্রমশ সাধারণ মর্যাদাবোধক অভিধায় পরিণত হয়েছে। ঐতিহ্যিক বাবুশ্রেণীর ভেদ, উপভেদ, বৈচিত্র্য ও শিক্ষিত বাঙালীর রূপ ও চরিত্রের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাবুর অর্থও বিচিত্র ও বহুমুখী হয়ে উঠেছে। প্রথম দিকের ছাত্র প্রসঙ্গে কোথাও 'বাবু' যুক্ত হয় নি। ১৮২৯ সালের হিন্দু কলেজের পারিতোষিক বিতরণের সংবাদে রামতনু লাহিড়ী, দিগম্বর মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, রাধানাথ সিকদার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি 'অসাধারণ ভাগ্যবান', 'মধ্যবিত্ত' ও 'দরিদ্র অথচ ভদ্রলোকদে'র কৃতী সন্তানদের সকলকেই একমাত্র 'শ্রী' যোগে পরিচয় দেওয়া হয়েছে।[৩২] কিন্তু ১৮৪৭ সালে 'মেদিনীপুর স্কুলের ছাত্র বাবু তারিণীচরণ চৌধুরি'-র সাক্ষাৎ সংবাদপত্রে মিলছে।[৩৩]
পদবি বাদ দিয়ে শুধু নামের সঙ্গে বাবু যুক্ত করে ব্যবহার আধুনিক বাঙালীর সৌজন্যবোধক স্বীকৃত সাধারণ রীতি। এ রীতি প্রাচীন নয়।[৩৪] নাগরিক সামাজিকতার ক্রমবিস্তার ও পরিসরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই রীতিটির ক্রমপ্রচলন ও প্রতিষ্ঠা। ব্যবহারিক সামাজিক শিষ্ট রীতি থেকে এটি ক্রমশ সংবাদপত্রের মাধ্যমে ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং কালক্রমে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্বিশেষে সৌজন্য ও মর্যাদাবোধক আবশ্যিক সম্বোধন রীতি হিশেবে বদ্ধমূল হয়েছে। বাংলা সংবাদপত্রে পদবিহীন ও পদযুক্ত নামের সঙ্গে বাবুর প্রয়োগ উনিশ শতকের মাঝামাঝির আগে অতি বিরল। ১৮১৮ সালে গোপীমোহন ঠাকুরের

মৃত্যু সংবাদে কেবল 'গোপীমোহনবাবু' উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৫] ১৮২২ সালে একটি ক্ষেত্রে রাজা নবকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলা হয়েছে 'শ্রীযুত মহারাজা গোপীমোহনবাবু'।[৩৬] ১৮৪৯ সালে 'চন্দ্রিকা' সম্পাদক অভিহিত হয়েছেন 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়বাবু' বলে।[৩৭] ১৮৪৩ সালে 'শীল বিদ্যালয়ে পাঠারম্ভ' সংবাদে একাধিকবার 'শীলবাবু' লিখিত হয়েছে ; সংবাদটি মূলত 'সেন্টজেবিয়া কলেজের অধ্যাপক রেবেরেণ্ড জনসন', 'সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ তাঁর লারন্স পিল', 'রেবেরেণ্ড আরবিন সাহেব' ও 'মেস্টর জর্জ টমসনের' বক্তৃতার অনুলিপি। সহজেই বোঝা যায় 'শীলবাবু' ইংরেজী রীতির Mr. Seal'-এর বাংলা বিকল্প।[৩৮] পদবির সঙ্গে 'মহাশয়/মশাই' যুক্ত করা সম্বোধন বা ব্যক্তিনির্দেশের প্রাচীন বাঙালী রীতি। পদবির সঙ্গে বাবু যুক্ত করে সম্বোধন বা ব্যক্তিনির্দেশ আজও সাধারণ রীতি নয়। ১৮৫০-৫২ সালের পর থেকে বাংলা সংবাদপত্রে পদবিহীন বাবু-যুক্ত হয়ে মান্যগণ্য ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ হামেশাই পাওয়া যায়। ১৮৭৮ সালের মধ্যে দ্বারকনাথবাবু (ঠাকুর), জয়কৃষ্ণবাবু (মুখোপাধ্যায়), প্রসন্নকুমারবাবু (ঠাকুর), কালীপ্রসন্নবাবু (সিংহ), আশুতোষবাবু (দেব), এমনকি বাঙালী ব্যক্তিনামের মাঝের পদটি বাদ দিয়ে অতি প্রচলিত ব্যবহারিক ও সামাজিক রীতি মাফিক—যে-রীতি আজও বিধিবদ্ধ—কালীবাবু (কালীপ্রসন্ন সিংহ), রাজেন্দ্রবাবু (রাজেন্দ্র দত্ত), ঈশ্বরবাবু (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত), কেশববাবু (কেশবচন্দ্র সেন), বঙ্কিমবাবু, দীনবন্ধুবাবু, দেবেন্দ্রবাবু (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর) দ্বিজেন্দ্রবাবু (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর)—এই ধরনের প্রয়োগ শিষ্ট লেখ্য রীতিসিদ্ধ হয়ে উঠেছে।[৩৯] তবে লক্ষ করলেই চোখে পড়ে, সাধারণ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে এই বাবু-যুক্ত ব্যক্তিনামের প্রয়োগ নেই বললেই চলে, এই প্রয়োগটি প্রধানত চিঠিপত্র, প্রশস্তি, সমালোচনা, বাদানুবাদ ইত্যাদি প্রসঙ্গে, যেখানে আন্তর মনোভাব প্রকাশের অবকাশ আছে। এই রীতি গোটা উনিশ শতকে তো বটেই, বিশ শতকের গোড়ার দিকে পর্যন্ত অব্যাহত ছিল ; ক্রমে শিষ্ট লেখ্য রীতি হিশেবে বর্জিত হয়। নামোল্লেখের ক্ষেত্রে কেবল 'শ্রী' যুক্ত হয় এবং সাহিত্য-শিল্প-রাজনীতি ইত্যাদির আলোচনায় পদবি-যুক্ত অথবা পদবি-হীন নাম ব্যবহারের রীতি দাঁড়িয়ে যায়। লৌকিক ক্ষেত্রে অবশ্য সাম্মানিক 'বাবু'র স্থান আজো অটুট আছে।

২· গোত্রবিচার

১৮৬২ সালে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'-য় কালীপ্রসন্ন সিংহ এক বংশগত কুলীন বাবুর কুলুজী আওড়াতে গিয়ে বলেছেন :

> কোম্পানীর বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দকুমারের ফাঁসি হবার কিছু পূর্ব্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন, সেকালে নিমকের দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল ; সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান—সেই অবধি বাবুরা বনেদী বড়মানুষ হয়ে পড়েন ।[১]

কলকাতার কুলীন বাবুযূথের উদ্ভবের কাল ও কারণ সম্পর্কিত এই সাধারণীকৃত মন্তব্যটি মোটামুটি ইতিহাসসম্মত । পরবর্তীকালের প্রায় সমস্ত বনেদী বাবুবংশের প্রতিষ্ঠা এই সময়ের মধ্যে । ১৭৬৬ সালে জানুয়ারি মাসে গোবিন্দরাম মিত্রের পৌত্র রাধাচরণ মিত্রের ফাঁসির হুকুম রদের অনুকূলে কলকাতার যে ৯৫ জন গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বাঙালী নামগুলো দেখলেই তা বোঝা যাবে । স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আছেন শোভারাম বসাক, শুকদেব মল্লিক, রাসবিহারী শেঠ প্রমুখ ১১জন বণিক-ব্যবসায়ী ; চূড়ামণি দত্ত, মদন দত্ত প্রমুখ ৯জন দত্ত ; গোকুল মিত্র, গঙ্গারাম মিত্র প্রমুখ ৬জন মিত্র ; ৫জন ঘোষ, ৪জন বোস ; একাধিক সেন, দাস, বিশ্বাস ; ব্রাহ্মণদের মধ্যে ৫জন ঠাকুর, ২জন মুখোপাধ্যায়, ১জন চক্রবর্তী, একাধিক ঘোষাল, হালদার, শর্মা ; সর্বোপরি আছেন নবকৃষ্ণ মুন্‌শি । কলকাতা ক্ষতিপূরণের অর্থের বাঁটোয়ারা কমিটির ১৩জন দেশীয় সদস্যের ১১জন হিন্দু বাঙালী সদস্যের মধ্যে ৫জনের নামই এই তালিকায় পাওয়া যায় ।[২] বাগবাজার, শোভাবাজার, নিমতলা, পাথুরিয়াঘাটা, বড়বাজার ইত্যাদির পরিচিত স্বনামধন্যরা ছাড়াও পরবর্তীকালের বড় বড় অনেক বনেদী বংশের প্রথম পুরুষদের সাক্ষাৎ এই তালিকায় মিলবে । নন্দকুমারের ফাঁসির দশ বছর আগেই এঁরা সম্ভ্রান্ত ও প্রতিষ্ঠিত এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে অধিকাংশই বাবুবংশের প্রপিতামহ এবং আদি বাবু । বাবুত্ব এঁদের অর্জিত । ভবানীচরণের ভাষায় এঁরা পরবর্তীকালের 'অধিকতর ভাগ্যবান লোকদের' পূর্বপুরুষ ।

 বাবুত্বের বনিয়াদ যে অপরিমিত বিত্ত, তা সংগ্রহ বা অর্জনের উপায়
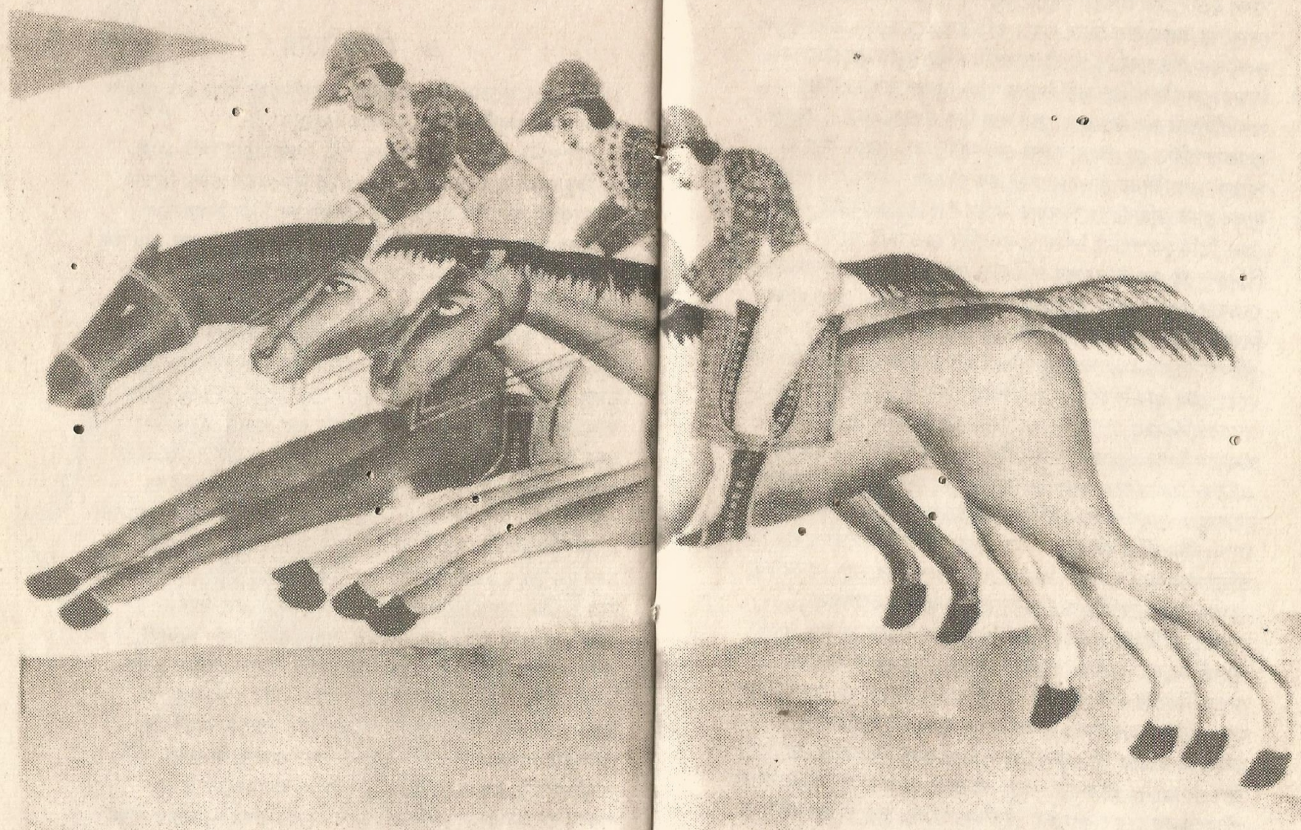
সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন যে 'দাওয়ানী'র কথা বলেছেন তা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। আঠারো শতকের মধ্যভাগে অপরিমিত বিত্ত অর্জনের উপায় ছিল প্রধানত বাণিজ্য-ব্যবসায়, দেওয়ানি ও বেনিয়ানি—এই তিনটি। বাণিজ্য-ব্যবসায় ছিল কুলগত বৃত্তি ও কুলগত সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ। কুলবহির্ভূত কারো পক্ষে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে সফল হওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল। শেঠ-বসাক-মল্লিক প্রভৃতি সে যুগের কলকাতার যেসব ধনাঢ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁরা মুখ্যত কুলবৃত্তির ঐতিহ্যবাহিত পথেই অপরিমিত বিত্ত অর্জন করেছিলেন। যাঁদের কুলবৃত্তি বাণিজ্য নয়, তাঁদের পক্ষে কোম্পানির ছত্রছায়ায় অপরিমিত বিত্ত অর্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা ছিল দেওয়ানিকর্ম।[৩] দেশীয় লোকসম্পর্কিত যে কোনো কাজে কোম্পানির বড় কোনো কর্তা বা সাহেব ব্যবসায়ীদের দেওয়ান ছাড়া এক পা চলা অসম্ভব ছিল। আদি যুগের ব্ল্যাক জমিদার গোবিন্দরাম মিত্রের পদগত উপাধি যাই হোক না কেন, তিনি কোম্পানির জমিদারি-কাছারির দেওয়ানই ছিলেন। খিদিরপুরের ঘোষাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোকুল ঘোষাল ভেরেলস্টের দেওয়ান এবং নবকৃষ্ণ খোদ ক্লাইভের দেওয়ান ছিলেন, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ছিলেন বোর্ড অব রেভিনিউর দেওয়ান।[৪] কোম্পানির ও কোম্পানির বড় কর্তাদের দেওয়ানিতে যত দ্রুত অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভ হতো, অন্য আর কিছুতে তা হওয়া সম্ভব ছিল না। এর পরেই ছিল সাহেব বণিকদের দেওয়ানি। বেনিয়ানি অপরিমিত বিত্ত অর্জনের অন্যতম উপায় হলেও তার স্থান ছিল দেওয়ানির নিচে। সোজাসুজি বেনিয়ান যাঁরা হতেন তাঁরা ছিলেন বিত্তবান, মুখ্যত বণিক-ব্যবসায়ী কুলোদ্ভূত, যেমন শুকদেব মল্লিক, নিমাইচরণ মল্লিক বা নকু ধরেরা, অথবা অন্য কুলবৃত্তির লোক কিন্তু কোনো বণিক-ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এছাড়া ছিল কোম্পানির সঙ্গে কোনো না কোনো সূত্রে সম্পর্কিত হয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য। কুলবৃত্তিগত ব্যবসায়ী-বেনিয়ান-তন্তুবায়-সুবর্ণবণিক পরিবারগুলোকে বাদ দিলে পরবর্তীকালের নামজাদা বাবুবংশগুলোর প্রথম পুরুষদের মধ্যে দেওয়ানিকর্মের সংখ্যাই বেশি চোখে পড়ে। দেওয়ানির প্রকারভেদের মধ্যে বিশেষ করে নিমক ও আফিমের দেওয়ানি ছিল লোভনীয়। দেওয়ানি-অর্জিত ধন যেমন দ্রুত লভ্য ও অপরিমিত ছিল, তেমনি ছিল দেওয়ানির প্রতিপত্তি ; আর এইজন্যে দেওয়ান পদবিটাই বিশেষ গৌরবজনক হয়ে বাবুবংশের কৌলীন্য বাড়িয়ে দিত।[৫] সাধারণীকৃত বনেদী বাবুবংশের উদ্ভবের মূলে দেওয়ানিকে নির্দেশ করে কালীপ্রসন্ন সম্ভবত যথেষ্ট ইতিহাসবোধেরই পরিচয় দিয়েছেন। কালীপ্রসন্নের প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহও পাটনা কুঠির চিফ মিডলটন ও রামবোলডের দেওয়ান ছিলেন।

কোম্পানির বড় বড় কর্মচারীদের সম্পর্কিত দেওয়ানির অবাধ আমল চলে হেস্টিংসের কাল পর্যন্ত। কর্নওয়ালিসের সময় থেকে তার ক্ষেত্র

ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে। এজেন্সি হৌসগুলোর জন্যে দেশীয় বেনিয়ানদের গুরুত্ব খর্ব হয়। বিভিন্ন সাহেব কোম্পানির দেওয়ানি, বেনিয়ানি, মুৎসুদ্দিগিরি ও স্বাধীন ব্যবসায়ই তখন বিত্তলাভের উপায় হয়ে ওঠে। স্বাধীন ব্যবসায়ী রামদুলাল সরকারের মতো লোককে বাদ দিলে আঠারো শতকের শেষ ভাগের আগেই যাঁরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁদের তুলনায় বিত্তশালিতায় পরবর্তী যুগের প্রতিষ্ঠালাভকারীরা অনেক পরিমাণে হীন। এঁদের ধারা চলেছে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত। ভবানীচরণের ভাষায় এঁরা 'ধনাঢ্য' আখ্যাত, এঁরা 'প্রধান কর্ম্ম অর্থাৎ দেওয়ানি বা মুচ্ছদ্দিগিরি' করেন। পামার কোম্পানির গঙ্গানারায়ণ সরকার, নীলকমল সেন, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি, এমন কি রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরও এই দ্বিতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি, গোত্রবিচারে কুলীন বাবু হলেও এঁরা দ্বিতীয় থাকের কুলীন।

কুলীন বাবুর গোত্রলক্ষণগুলো আঠারো শতকের মধ্যভাগেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। নিছক বিত্তশালিতা থেকে সম্ভ্রান্তত্ব বা মহাশয়ত্ব লাভ, তা থেকে বাবুত্ব লাভ,—মনে হয়, এত সরলীকৃতভাবে ব্যাপারটা ঘটে নি। অতীতে পদ, বিত্ত, ও মহাশয়ত্বের একটা বাঁধা পথ ছিল ; সবই ছিল কুল-কর্ম-বৃত্তিনির্ভর এবং সেটাই ছিল লোকচক্ষে স্বাভাবিক। বাঁধাপথে বণিক-ব্যবসায়ী শেঠ-বসাকরা বিত্তশালী হবেন কিংবা নবাববাদশার কর্মচারী দেওয়ান মাণিকচাঁদ, রাজা রাজবল্লভ, মহারাজা নন্দকুমার বা ভূম্যধিকারীরা বিত্তশালী ও সম্ভ্রান্ত পদবাচ্য হবেন, তার মধ্যে কোনো অভিনবত্ব ছিল না। এঁরা লোকের পরিচিত পদ ও কর্মের স্বাভাবিক গণ্ডির অন্তর্ভুক্তই ছিলেন এবং এঁদের সংখ্যাধিক্য ছিল না। কিন্তু আঠারো শতকের মধ্যভাগেই কলকাতার ভারতীয় ও অভারতীয় বহু ভাষাভাষী বিচিত্র জনকুণ্ডলির মধ্য থেকে এমন এক দল ভুঁইফোঁড়ের আবির্ভাব ঘটল, যাঁরা বাণিজ্য ও প্রভুত্বকামী ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট, কুলবহির্ভূত বৃত্তি ও কর্মের মাধ্যমে অর্জিত বিত্তের অধিকারী, ক্ষমতায় ও প্রতিপত্তিতে সীমাহীন, বণিক-রাজশক্তির দেশীয় প্রতিভূ। এঁরা ব্রাহ্মণ হয়েও বেনিয়া, কায়স্থ হয়েও ব্যবসায়ী, শূদ্র হয়েও সামাজিক প্রভুত্বকামী, মহাশয় না হয়েও মহাশয়ত্বের দাবিদার। পাঁচ-সাত বছরের মধ্যেই এঁদের এক এক জনের পূর্ণাবয়ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ এবং সংখ্যায় এঁরা যথেষ্ট। প্রচলিত পুরনো কোনো পদ বা পদবিতে এই শ্রেণীকে আখ্যাত করা চলে না। ব্যক্তিগতভাবে দেওয়ান, বেনিয়ান, মুনশি ইত্যাদি রূপে পরিচিতি লাভ করতে করতে শ্রেণী হিসেবে এঁরা আখ্যাত হলেন বাবু নামে। কেমন করে যে বাবু শব্দটি নির্দিষ্ট হয়ে গেল তা বলা কঠিন। সম্ভ্রমাত্মক বাবু শব্দের প্রাচীন সামাজিক প্রয়োগের নজির বাংলায় মেলে না বললেই চলে, যদিও শব্দটি অপ্রচলিত ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশের বাইরে
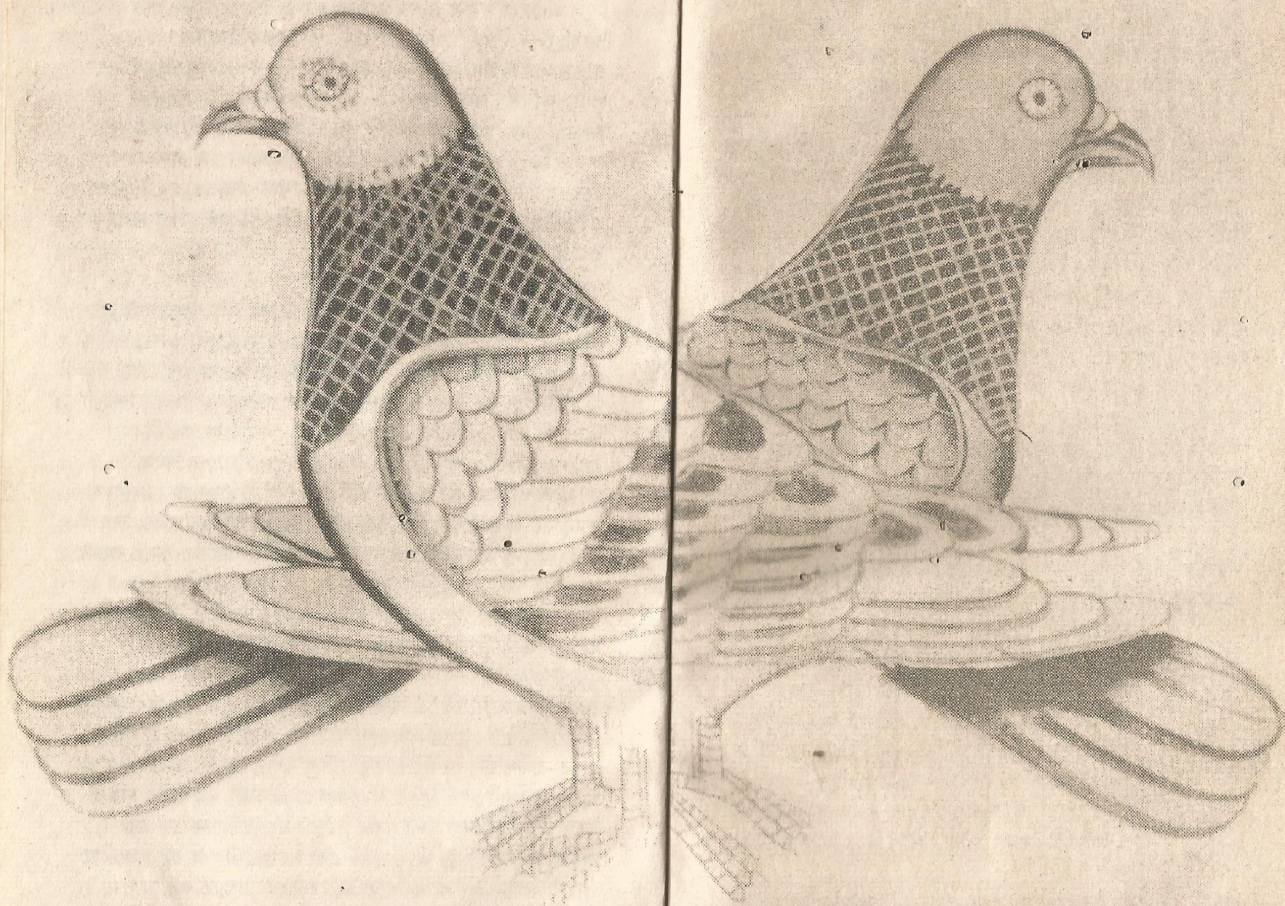
রাজকীয় পরিবেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে সম্ভ্রমাত্মক ও বিশেষ পদমর্যাদাবোধক রূপে শব্দটি প্রচলিত ও পরিচিত ছিল।[৬] আঠারো শতকের মধ্যভাগে কলকাতা ছিল বাংলাদেশের যে-কোনো শহর থেকে একেবারে স্বতন্ত্র—কোম্পানির উচ্চ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারী, বেনিয়ান, দেওয়ান, দালাল, মুৎসুদ্দি ও বিচিত্র কর্মজীবীর মিশ্র শহর। বাঙালী বণিক ও নতুন হিন্দু বিত্তশালীদের প্রাধান্য এবং জনসংখ্যায় বাংলাভাষীর সংখ্যাধিক্য থাকলেও কলকাতার সামাজিক জীবন ছিল মিশ্র প্রকৃতির। মনে হয়, সেই কারণেই উত্তর ভারতের প্রচলিত ও পরিচিত শ্রেণীবোধক বাবু শব্দটির ব্যাপক প্রবেশ ঘটেছিল। বাঙালী অবাঙালী নির্বিশেষেই বাবু শব্দটি প্রযুক্ত হতো। কিন্তু বাবু আখ্যাতদের মধ্যে বাঙালী বিত্তশালীদের সংখ্যাধিক্যের জন্যে এবং কালক্রমে বিশেষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি নতুন বাঙালী হিন্দু অভিজাত শ্রেণী গড়ে ওঠার পথে শব্দটি বাঙালীর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজ শাসনকর্তারা, ইংরেজ ও বিদেশী বণিকেরা এই শব্দটি তদানীন্তন প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করেছিল। 'বাবু' হয়ে উঠেছিল বিত্তশালী অভিজাত বাঙালী হিন্দু এবং পরে কুলকর্ম-বৃত্তিবহির্ভূত স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোকের শ্রেণীবোধক শব্দ। প্রথমোক্ত প্রকৃত বাবুশ্রেণীর অনুষঙ্গ রূপেই দ্বিতীয়োক্ত বাবুদের একটি পৃথক শ্রেণী আঠারো শতকের শেষ ভাগেই গড়ে উঠতে শুরু করেছিল এবং বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের ধারাপথে উনিশ শতকের প্রায় শেষদিক পর্যন্ত বাবু শব্দ বিচিত্র অর্থে সম্প্রসারিত হয়েছিল।

নক্শার উদ্দিষ্ট বাবুর গোত্রপরিচয় দিতে গিয়ে কালীপ্রসন্ন বলেছেন:

> বনেদী বড় মানুষ হতে গেলে বাঙালী সমাজে যে সরঞ্জামগুলি আবশ্যক, আমাদের বাবুদের তা সমস্তই সংগ্রহ করা হয়েছে—বাবুদের নিজের একটি দল আছে, কতকগুলি ব্রাহ্মণপণ্ডিত, কুলীনের ছেলে, বংশজ, শ্রোত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, গন্ধবেণে আর কাঁসারী ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অনুগত—বাড়ীতে ক্রিয়েকর্ম্ম ফাঁক যায় না, বাৎসরিক কর্ম্মেও দলস্থ ব্রাহ্মণদের বিলক্ষণ প্রাপ্তি আছে; আর ভদ্রাসনে এক বিগ্রহ, শালগ্রামশিলে ও আকবরী মোহর পোরা লক্ষ্মীর খুঁচির নিত্য সেবা হয়ে থাকে।[৭]

'বনেদী বড় মানুষ কবলানো' বা বাবুত্ব অর্জনের 'সরঞ্জামগুলি' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। 'সরঞ্জামগুলি' জড়ো করতে যে প্রভূত বিত্তের প্রয়োজন, প্রপিতামহ আদি বাবুরা তা সংগ্রহ করে ফেলেছিলেন পাঁচ-দশ বছরের মধ্যেই। সে বিত্তের পরিমাণও যেমন, তা সংগ্রহের পদ্ধতিও তেমনি পূর্বাপর অকল্পনীয়। ব্যক্তিগত উদ্যম, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সাহসের পরিচয়

থাকলেও, সে পদ্ধতিতে একমাত্র উগ্র স্বার্থচিন্তা ছাড়া ন্যায়নীতি, ধর্মাধর্ম, আত্মমর্যাদার কোনো স্থান ছিল না। ইংরেজের সান্নিধ্যে সম্পূর্ণ নতুন জীবনযাত্রার পরিচয় ঘটলেও প্রাগ্রসর আধুনিকতার তিলমাত্র ধারণা তাঁদের জন্মায় নি। যে-ইংরেজ বণিক বা কর্মচারীর তাঁরা সহযোগী ছিলেন, তাদের মতোই তাঁরা ছিলেন সংস্কৃতিহীন, ভাগ্যান্বেষী, কুটিল, হৃদয়হীন ও অত্যাচারী। দেশীয় মানুষ সম্পর্কে সামন্তযুগীয় দায়িত্ব ও ঔদার্যের লেশমাত্র বোধ তাঁদের ছিল না। কলকাতার মিশ্র সামাজিক পরিবেশে আচার-আচরণের প্রথাগত নৈতিক ও সামাজিক বিধিনিষেধে গণ্ডিবদ্ধ থাকাও সম্ভব ছিল না। তাঁরা জানতেন, যত প্রতিপত্তিশালী ও বিত্তশালীই হন না কেন, তাঁরা অজ্ঞাতকুলশীল ভুঁইফোড়; উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ হলেও প্রাচীন ও প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিতে কুলবৃত্তিচ্যুত 'অমহাশয়'; তাছাড়াও হিন্দু প্রথাগত বর্ণবিভাগ অনুসারে অনেকের গোত্রপরিচয়ও ছিল হীন। এইজন্যেই তাঁদের প্রয়োজন হয়েছিল সামাজিক প্রতিষ্ঠার।

বর্গীহাঙ্গামার হাত এড়াতে পলাশীযুদ্ধের এক দশক আগে থেকেই গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলের কিছু কিছু উচ্চ বর্ণের হিন্দু কলকাতাবাসী হয়েছিলেন, পলাশীযুদ্ধের সমকালেই রাজা রাজবল্লভ, নন্দকুমার তথা গুরুদাস রায় প্রমুখ প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ক্ষমতাবান ও অর্থবান উচ্চবর্ণের বনেদী অভিজাতরা কলকাতাকে আশ্রয় করেছিলেন। তাঁদের ঘিরে নিঃসন্দেহে তদানীন্তন কলকাতার তরল সামাজিক পরিবেশেই এমন এক সামাজিক আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল, যা ছিল স্বীকৃত প্রাচীন বিধিবিধানসম্মত এবং যার সঙ্গে একমাত্র কলকাতাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত এই ঐতিহ্যহীন অজ্ঞাতকুলশীল নতুন আভিজাত্যকামী বিত্তবানশ্রেণীর সামাজিক নেতৃত্বের প্রশ্নে বিরোধ বেধেছিল। কোম্পানির প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিল তার বশংবদ, অনুগত এই নতুন শ্রেণীর দিকে। অর্থ ও প্রতিপত্তির মতোই এই শ্রেণী সামাজিক ও জাতিগত কর্তৃত্বে আসুক, এইটিই ছিল কোম্পানির মনোগত ইচ্ছা। জাতি-ধর্মসংক্রান্ত বিচারের ক্ষেত্রে সুবিধার জন্যে এবং মুখ্যত প্রাচীন ও প্রচলিত মতামতের বিরুদ্ধতা এড়াতে কোম্পানি একশ্রেণীর বৃত্তিভোগী অনুগত ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের পোষ্য করে তুলেছিল। জেলখানায় নন্দকুমারের জাতিচ্যুতির আশংকা অমূলক বলে কোম্পানির পোষ্য পণ্ডিতেরা বিধান দিতে কুণ্ঠা বোধ করে নি।[৮] ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের বৃত্তির জন্যে কোম্পানির বরাদ্দ তহবিল ছিল।[৯] জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মতো পণ্ডিতও কোম্পানির পেনসনের জন্যে লালায়িত ছিলেন, হেসটিংসের 'পান' পেয়ে কৃতার্থ হতেন। কোম্পানির উদ্যোগে জাত-কাছারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তার বিচারপতি হয়েছিলেন কান্তবাবু ও মুনশি নবকৃষ্ণ—যা প্রচলিত সমাজবিধানে অবিশ্বাস্য ছিল। নন্দকুমারের সঙ্গে নবকৃষ্ণ-কান্তবাবুর বিরোধের অন্য যত

কারণই থাকুক, সামাজিক নেতৃত্ব লাভের প্রশ্নটি ছিল নিঃসন্দেহে অন্যতম। নবকৃষ্ণ-কান্তবাবুদের সামাজিক নেতৃত্ব লাভের পক্ষে নন্দকুমার ছিলেন বিরাট বাধা। যে নবকৃষ্ণেরা জাত-পাঁতের ধারকবাহক ও ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের ঐতিহ্যসৃষ্টিকারী কুলধর্মরক্ষক, তাঁরা নন্দকুমারের ফাঁসির ক্ষেত্রে অনাদি অনন্ত কালের হিন্দু বিধিসম্মত 'ব্রাহ্মণের অবধ্যতা' সম্পর্কে মুখ খোলেন নি। মনে হয়, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত কারণে শুধু নয়, সামাজিক কারণেও 'ব্রাহ্মণ' নন্দকুমারের ধ্বংস আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল। নন্দকুমারের দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধাচারী, উপেক্ষাকারীদের স্তব্ধ করে দিয়েছিল, নবকৃষ্ণরা কলকাতার সামাজিক রাজ্যপাট দখল করেছিলেন এবং এ দখল সম্পূর্ণ হয়েছিল কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে। প্রাচীন জমিদার বংশগুলি উৎসন্ন হতে থাকলে, তাদের জমিদারির মালিক হয়ে উঠলেন নবকৃষ্ণজাতের দেওয়ান-বেনিয়ান-মুৎসুদ্দিরা ; অর্জিত বিত্ত সম্পত্তি ও জমিতে ঢেলে অনায়াসলব্ধ উপার্জন ও মুনাফায় নিশ্চিন্ত হয়ে ক্রমশ হয়ে উঠলেন কলকাতার সমাজ তথা সংস্কৃতির অধিপতি ; কোম্পানির দৌলতে তাঁরা রাজা-মহারাজা খেতাবে মহিমান্বিত হতে লাগলেন। কালীপ্রসন্নের ভাষায় :

> নবাবী আমল শীতকালের সূর্য্যের মতো অস্ত গ্যালো। মেঘান্তের রৌদ্রের মতো ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো। বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। নবো মুনশি, ছিরে বেণে ও পুঁটে তেলি রাজা হলো। সেপাই পাহারা, আশাসোটা ও রাজা খেতাব, ইণ্ডিয়া রবারের জুতো ও শান্তিপুরে ডুরে উড়ুনির মত রাস্তায় পাঁদাড়ে ও ভাগাড়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো।'[১০]

'বনেদী বড় মানুষ কবলানো'র সরঞ্জামগুলোর মধ্যে ভদ্রাসন ও 'ভদ্রাসনে এক বিগ্রহ, শালগ্রামশিলে'র পর্ব শুরু হয়েছিল বিত্তসংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে। ভদ্রাসন ও ভদ্রাসনে বিগ্রহ বনেদীত্ব অর্জনের প্রাথমিক পর্যায় এবং চিরাচরিত পন্থা। সুতানুটির আধা গ্রাম্য পরিবেশে ও দু'দশটি পাকা বাড়ি ব্যতীত একচেটে চালাঘরের দরিদ্র জনবসতির মধ্যে এক একটি দেওয়ান-বেনিয়ানের বিরাট প্রাসাদ যে সেদিন জনচিত্তকে কতখানি বিমূঢ় করত, তা সহজেই অনুমান করা যায়। ভদ্রাসন বা বসতবাটির বিরাটত্বের জন্যেই ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন কুমারটুলির বনমালী সরকার।[১১] আনুষঙ্গিক বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা, মন্দির নির্মাণ ও তৎসংক্রান্ত ব্যয়ের রেকর্ড করেছিলেন আদি যুগের 'ব্ল্যাক জমিন্দার' গোবিন্দরাম মিত্র। তিনি জীবদ্দশাতেই মন্দিরনির্মাণ, পূজা ও ধর্মীয় কৃত্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ এমন আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সঙ্গে ব্যয় করেছিলেন, যা কলকাতায় আগে কখনো দেখা যায় নি। ১৭৩০ সালে তৈরি তাঁর চিৎপুরের নবরত্ন মন্দিরটি নাকি

অক্টরলোনি মনুমেন্টের চেয়েও উঁচু ছিল।[১২] বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা, মন্দির, ঠাকুরবাড়ি, ঘাটপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি প্রাচীন ধর্মীয় কৃত্যের একটা প্রবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল এবং এসবই ছিল বনেদীত্ব কবলানোর কৌশলমাত্র এ ব্যাপারটাকে এই শ্রেণীর ন্যায়নীতিবর্জিত অমানবিক পন্থায় বিত্ত উপার্জন ও তদনুরূপ জীবনযাপনজনিত অপরাধবোধের মানসিক রেচন (Catharsis) বলে মনে করলে সংগত হবে না। মানসিক রেচনের ব্যাপার থাকলে তা ব্যক্তিগত, শ্রেণী হিশেবে সাধারণ সত্য নয়। মানসিক রেচনের ব্যাপারই যদি হতো, তাহলে ১৭৩০ সালের নবরত্নের প্রাতঃস্মরণীয় গোবিন্দরামকে ১৭৫৮ সালে কলকাতার ক্ষতিপূরণের (ক্ষতি না হওয়া সত্ত্বেও) অর্থের সিংহভাগ কেড়ে (তিন তিনটি রক্ষিতার ভাগ সমেত) নিতে দেখা যেত না;[১৩] ঠিকাদার গোকুল মিত্রকে দেখা যেত না বাগবাজারে প্রতিষ্ঠার জন্যে বিষ্ণুপুরের মদনমোহন মর্টগেজে হাতাতে।[১৪]

এসবই বনেদী বড় মানুষ কবলানোর সরঞ্জাম সংগ্রহের নীতিহীন কৌশল। এই একই কৌশলে সকলকে টেক্কা দিয়েছিলেন ব্রাহ্মণপত্নীকে বলাৎকারের অভিযোগে অভিযুক্ত[১৫], সাত সাতটি 'পত্নী বা উপপত্নীর' অধিকারী, জাত-কাছারির বিচারপতি মহারাজা নবকৃষ্ণ। অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ নিয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে বিবাদ ও ছলনা[১৬], বাংলাদেশের সমস্ত বিখ্যাত বিগ্রহগুলো জড়ো করে 'সভা-বাজার' স্থাপন ইত্যাদি ধর্মকৃত্য পালনের পেছনে একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা—'বড় মানুষ কবলানো'। বলা চলে, তদানীন্তন কলকাতার 'নেটিভ টাউন'-এর স্বল্পায়নের তুলনায় এই শ্রেণীর বনেদীত্বকামীদের সংখ্যার অনুপাত ছিল যথেষ্ট বেশি। তার ফলে সামাজিক আধিপত্যের জন্যে প্রতিযোগিতা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতায় যিনি সবাইকে হারিয়ে দিয়েছিলেন তিনি নবকৃষ্ণ। কোম্পানির সমর্থন ও আনুকূল্যে জাত-কাছারির বিচারপতি নবকৃষ্ণ কলকাতার সামাজিক ক্ষেত্রে প্রবল প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিলেন বেশকিছু আগে থেকেই এবং সেই প্রভাবের বলেই মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর তিনি করলেন 'একজাই'। এই একজাই-এর কুলীন ও ঘটকদের সভায় দক্ষিণ রাঢ়ী মৌলিক কায়স্থ হলেও তিনি হলেন সমাজপতি।

কলকাতার এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের তিনি বশীভূত করলেন; ব্রাহ্মণ ও কুলীন কায়স্থকে ডিঙিয়ে তিনি হলেন গোষ্ঠীপতি, তারই পরিণাম হল 'দল',—যার মধ্যে রইল 'ব্রাহ্মণপণ্ডিত, কুলীনের ছেলে, বংশজ, শ্রোত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য তেলী, গন্ধবেণে, আর কাঁসারী ও ঢাকাই কামার' ইত্যাদি বর্ণ। তন্তুবায় ও সুবর্ণবণিকেরা চিরদিন নিজস্ব গোষ্ঠীকেন্দ্রিক, তাদের বাদ দিলে এইটেই হল কলকাতার তথাকথিত দলের প্যাটার্ন। এই দল নিয়ে প্রতিযোগিতা বা দলাদলি সেইদিন থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।[১৭]

আঠারো শতকের শেষদিকের কলকাতার নতুন বিত্তবান শ্রেণীর মধ্যে কায়স্থের সংখ্যাধিক্যই চোখে পড়ে। তাই সামাজিক নেতৃত্বে কায়স্থের প্রাধান্যই স্বাভাবিক। এই প্রাধান্যের জন্যে সেদিনকার বহু বনেদী কায়স্থ পরিবার অজ্ঞাতকুলশীলত্ব ঘুচিয়েছেন, 'বল্লালী রেজেস্টারীতে... বংশাবলি রেজিস্টার্ড' করিয়ে নিয়ে, অনেকে পাকাপোক্ত কায়স্থ হয়েছেন।[১৮] ব্রাহ্মণের নেতৃত্বেও দল ছিল, কিন্তু ক্ষমতায় প্রতিপত্তিতে কায়স্থ সমাজপতিদের দলের সঙ্গে তুলনা হয় না।[১৯] কায়স্থদের দলের মধ্যেও দলাদলি কম তীব্র ছিল না। নবকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত শোভাবাজারের দলের সঙ্গে শক্তিশালী কায়স্থ বিরুদ্ধ দলের রেষারেষি উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত চলেছে। নবকৃষ্ণের সঙ্গে হাটখোলার দত্ত ও চূড়ামণি দত্তের রেষারেষি এবং পরবর্তী কালের 'কালীপ্রসাদী হেঙ্গমা' আঠারো শতকের শেষ থেকে শুরু হওয়া দলাদলির সুপরিচিত ঘটনা।[২০]

বড় মানুষ কবলানোর প্রতিযোগিতায় অস্বাভাবিকভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল প্রথাসিদ্ধ ঐতিহ্যিক ধর্মকৃত্যাদি—পূজা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, বাৎসরিক ক্রিয়াকর্ম, এমন কি গঙ্গাযাত্রা পর্যন্ত। নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধ থেকে রমাপ্রসাদ রায়ের মাতৃশ্রাদ্ধ আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত একটানা শ্রাদ্ধের কাহিনীগুলো ঘাঁটলে বোঝা যায় ধার্মিকতার নামে কী দুর্মর রক্ষণশীলতার পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল; পূজা, বাৎসরিক ক্রিয়াকর্মের আড়ম্বরে সেই রক্ষণশীলতা আরও দৃঢ়মূল হয়েছিল। পুনরুজ্জীবিত রক্ষণশীলতা যেন এই বড় মানুষদের ধ্বজদণ্ড হয়েছিল। বৃত্তি-বিদায়জীবী দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-ভট্টাচার্যের দল বড় মানুষদের অনুগ্রহ পাকাপোক্ত করার জন্যে সেই রক্ষণশীলতাকে লালিত করেছিল। রক্ষণশীলতার এই সাড়ম্বর পুনরুজ্জীবনই বাংলাদেশে সতীদাহের ক্রমবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। ১৮৩০ সাল পর্যন্ত সতীদাহের ঘটনাগুলো বিচার করলে বেশ দেখা যায়, এই জঘন্য অনুষ্ঠানটির এলাকা হচ্ছে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী ভাগীরথী অঞ্চল, যেখানে এই নতুন বড় মানুষদের রক্ষণশীলতার হাস্যকর আড়ম্বর; ক্রমবর্ধমান অনুষ্ঠান যেন সতীদাহের পুনরুজ্জীবন।[২১]

ধর্মীয় কৃত্যাদির অপরিমিত আড়ম্বরের সঙ্গে সঙ্গে ছিল বড় মানুষদের জীবনযাত্রার আড়ম্বর ও বিলাসব্যসনের বল্গাহীন প্রকাশ। 'নবাবী' বললে আক্ষরিক অর্থে যা বোঝায়, তাদের জীবনচর্যা ছিল তাই। এই নবাবীর আদর্শ ছিল চোখের সামনে কলকাতারই 'ইংরেজ-নবাবরা', যাঁরা অনুকরণ করতেন দেশী নবাবদের। ক্লাইভ, ভেরেলস্ট, হেস্টিংসের নিত্য পার্শ্বচর বেনিয়ান-দেওয়ান-মুনশিরা নবাবীর আদর্শ বলতে তাঁদের ইষ্টদেবদেরই দেখেছেন। কিন্তু নাচগান-পানভোজনের দেশী-বিদেশী কায়দার বিলাসিতায় তাঁরা ইংরেজ নবাবদেরও টেক্কা দিয়েছেন; এর সঙ্গে খাঁটি দেশী কায়দায় বাইজীনাচ, বাগানবাড়ি, মাইফেল, রক্ষিতা ইত্যাদিতে একে অন্যকে হার মানিয়েছেন। তাঁদের

পরবর্তী বংশধরেরা নিশ্চিন্ত বিলাসে জন্মগত বনেদী বাবুত্বের অধিকারে এই জীবনচর্যাকে ঘোড়দৌড়ের মাঠ, বুলবুলির লড়াই, 'গোলাপজল দিয়ে জলশৌচ, ঢাকাই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে পুরা, মুক্তভস্মের চূণ দিয়ে পান খাওয়া··· কুকুরের বিয়েয় লাক টাকা খরচ, যাত্রায় নোট প্যালা, তেল মেখে চার ঘোড়ার গাড়ী চড়ে ভেঁপু বাজিয়ে স্নান করতে যাওয়া' পর্যন্ত টেনে নিয়ে সম্পূর্ণতা দিয়েছেন ; আর জমিদারি, শহরে সম্পত্তি, সুদের কারবারে নিয়োগ-করা পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহের ধন 'আকবরী মোহর পোরা লক্ষ্মীর খুঁচি'র মতো 'নিত্য সেবা' পেয়েছে। ইংরেজ প্রভুদের কাছে জোড়হস্ত, মনস্তুষ্টি ও স্তাবকতায় সদাব্যগ্র এই প্রতিপত্তিশালী দেওয়ান-বেনিয়ানরা সামাজিক নেতৃত্ব লাভের পর ভাট-ঘটক, অর্থী-প্রার্থী, ভাঁড়-মোসায়েব পরিবৃত হয়ে বাবুত্বের উর্ধ্বে উঠে গিয়েছিলেন, কেবল খেতাব নয়, মানসিকতায়ও তাঁরা 'রাজা-মহারাজা' হয়ে উঠেছিলেন। রাজার চিরাচরিত কর্তব্য ধর্মসংরক্ষণ, পোষ্যপালন ছাড়াও গুণীজনের রক্ষণ। সেই মহৎ কর্তব্যের অনুকরণের দৃষ্টান্ত রাখতে এঁদের কেউ কেউ বিশেষ উৎসাহও দেখিয়েছিলেন।[২২] তাতে কলকাতায় পণ্ডিতদের কিছুটা সমাদর বেড়েছিল, কবিগান, হাফ-আখড়াই, ফুল-আখড়াই, পাঁচালি, টপ্পা ও যাত্রা ইত্যাদি মধ্যযুগের সংস্কৃতির এক বিকৃত সংস্করণ আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই সংস্কৃতির সৃষ্টি আদি বাবুশ্রেণীর রুচির যোগান দিতে এবং ইংরেজিশিক্ষিত নতুন গোত্রের বাবুশ্রেণীর আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত এর প্রভাব ছিল একচেটে।

৬

দ্বিতীয় স্তরের কুলীনগোত্রের বাবুরা আদি বাবুদের দ্বিতীয়-তৃতীয় পুরুষের সমবয়সী। তাঁদের বিত্ত অর্জনের পন্থা আগের যুগের মতো একই রকম হলেও, তার ক্ষেত্র ছিল সংকুচিত, এবং অর্জিত বিত্ত ছিল তুলনায় পরিমিত। 'পাঁচ বছর কর্ম্ম করে মৃত্যুকালে বিশ লক্ষ টাকা' না রেখে যেতে পারলেও রামমোহন রায় যথেষ্ট কম সময়ের মধ্যেই যথেষ্ট বিত্ত সঞ্চয় করেছিলেন, রামকমল সেনেরও সময় বেশি লাগে নি, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় বা গঙ্গানারায়ণ সরকারেরও লাগে নি। বিত্ত অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কেও আগের তুলনায় তাঁদের চেতনার বেশি হেরফের ছিল না।[২৩] সুদের কারবার, কোম্পানির কাগজ ও জমিদারির আয় ছিল রামমোহন রায়ের মতো মানুষেরও নিশ্চিন্ততার গ্যারান্টি।

আদিদের সঙ্গে এই স্তরের বাবুদের চরিত্রে ও মানসিকতায় পার্থক্য ছিল, এবং সে পার্থক্য গুণগত। তাঁদের মানসিকতাতেই প্রথম ধরা পড়ে আধুনিক নাগরিকতার লক্ষণগুলো। প্রচলিত রীতি ও প্রথা সম্পর্কে সংশয় ও প্রশ্ন এবং সেই সঙ্গে সংস্কার ও শোধনের ইচ্ছা তাঁদের মধ্যেই প্রথম জাগে। কৃত্য ও মানসিকতার ঐতিহ্যিক ছাঁচে ঢালা বাবুযূথের মধ্যে থেকে তাঁরাই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন

ব্যক্তিচরিত্র নিয়ে। মিল-অমিলের মধ্যেও এই স্তরের বড় মানুষদের চরিত্র কম সাধারণীকৃত, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে সুস্পষ্ট। তাঁদের প্রায় সকলেই ভালো রকম ইংরেজি জানতেন, ফার্সি তো জানতেনই, অনেকে সংস্কৃত জানতেন। আদি যুগের বাবুদের ইংরেজি জ্ঞান কতখানি ছিল তা অনুমানের বিষয়। শোনা যায় 'ব্ল্যাক জমিন্দার' গোবিন্দরাম ইংরেজি জানতেন, নবকৃষ্ণের জানার কথা, রামলোচন ঘোষ ভালো জানতেন।[২৪] বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, সরকার ইত্যাদিরা কেমন ইংরেজি জানতেন তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে।[২৫] ইংরেজি না-জানা আদি বাবুদের বাবুত্বের প্রতিবন্ধক ছিল না। দ্বিতীয় স্তরের এই বাবুরা কেউ কেউ ভালো ইংরেজিই শেখেন নি, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বৃহত্তর জগৎ ও জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। তাঁদের সকলেই ছিলেন সর্বাঙ্গীণ ইংরেজি-শিক্ষার উৎসাহী প্রবক্তা। তাঁরাই লেখাপড়া-জানা খাঁটি অর্থে প্রথম শিক্ষিত বাঙালী। আদি বাবুরা দুর্গোৎসবে বাইজী নাচিয়ে, হিন্দুস্থানী সুরে বিলাতি সুর মিশিয়ে, পানভোজনে ইংরেজ প্রভুদের যত মনস্তুষ্টিই করে থাকুন না কেন, তাঁদের প্রতি প্রভুদের যে কী অপরিসীম অবজ্ঞা ছিল তা অতিবিদিত।[২৬] দ্বিতীয় স্তরের বাবুরাই সর্বপ্রথম ইংরেজদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা আদায় করেছেন। ব্যবহারিক ধর্ম, সামাজিক কৃত্য ও প্রথাগত জীবনযাত্রার নির্বোধ অতিরেককে যুক্তিভিত্তিক ও মানবধর্মী করার আকাঙ্ক্ষায় তাঁদের কেউ কেউ হয়েছিলেন প্রতিবাদী, কেউ কেউ রক্ষণশীল যুক্তিবাদী। রামমোহন ও তাঁর অনুবর্তীরা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধতা করে আচারসর্বস্ব বহির্মুখী ধর্মবিশ্বাসের মূলে ঘা দিয়েছিলেন, যুক্তি ও মানবতার প্রেরণায় সতীদাহের বিরোধিতা করেছিলেন, রামকমল-রাধামাধবেরা রামমোহনের বিরুদ্ধতা করলেও ধর্ম ও সামাজিক কৃত্যকে মাত্রা ও সংযমের গণ্ডির মধ্যে রেখে এক যুক্তিসিদ্ধ রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন ; কিন্তু সামাজিক কল্যাণবোধ, নাগরিক দায়িত্ববোধ, জাতিগত সমুন্নতির আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা—যেসব লক্ষণে তাঁরা আদি বনেদীদের চেয়ে স্বতন্ত্র—সেসবে তাঁদের মধ্যে অমিল ছিল না। তাঁরাই বাংলাদেশে ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের পথিকৃৎ এবং জগৎ-জীবনের এক নতুন মূল্যবোধের আদি স্রষ্টা। একাধিক বনেদি বংশের দ্বিতীয়-তৃতীয় পুরুষের কেউ কেউ শিক্ষায় ও মানসিকতায় এই স্তরের বড় মানুষদের সমশ্রেণীভুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রতিবাদী ও রক্ষণশীল দুই ধরনের লোকই ছিলেন। প্রথম দলে ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি, দ্বিতীয় দলে রাধাকান্ত দেবের মতো অতি-অভিজাত পরিবারের সন্তান।[২৭]

জীবনাচরণে, বেশভূষায়, চালচলনে দুই স্তরে বাবুদের বাহ্যিক কোনো পার্থক্য ছিল না। বেশভূষা ছিল মুসলমান 'গ্রাণ্ডির' মতো[২৮] ; বাগানবাড়ি, পানভোজন, ইংরেজ মুরুব্বিদের আপ্যায়ন (দুই একটি
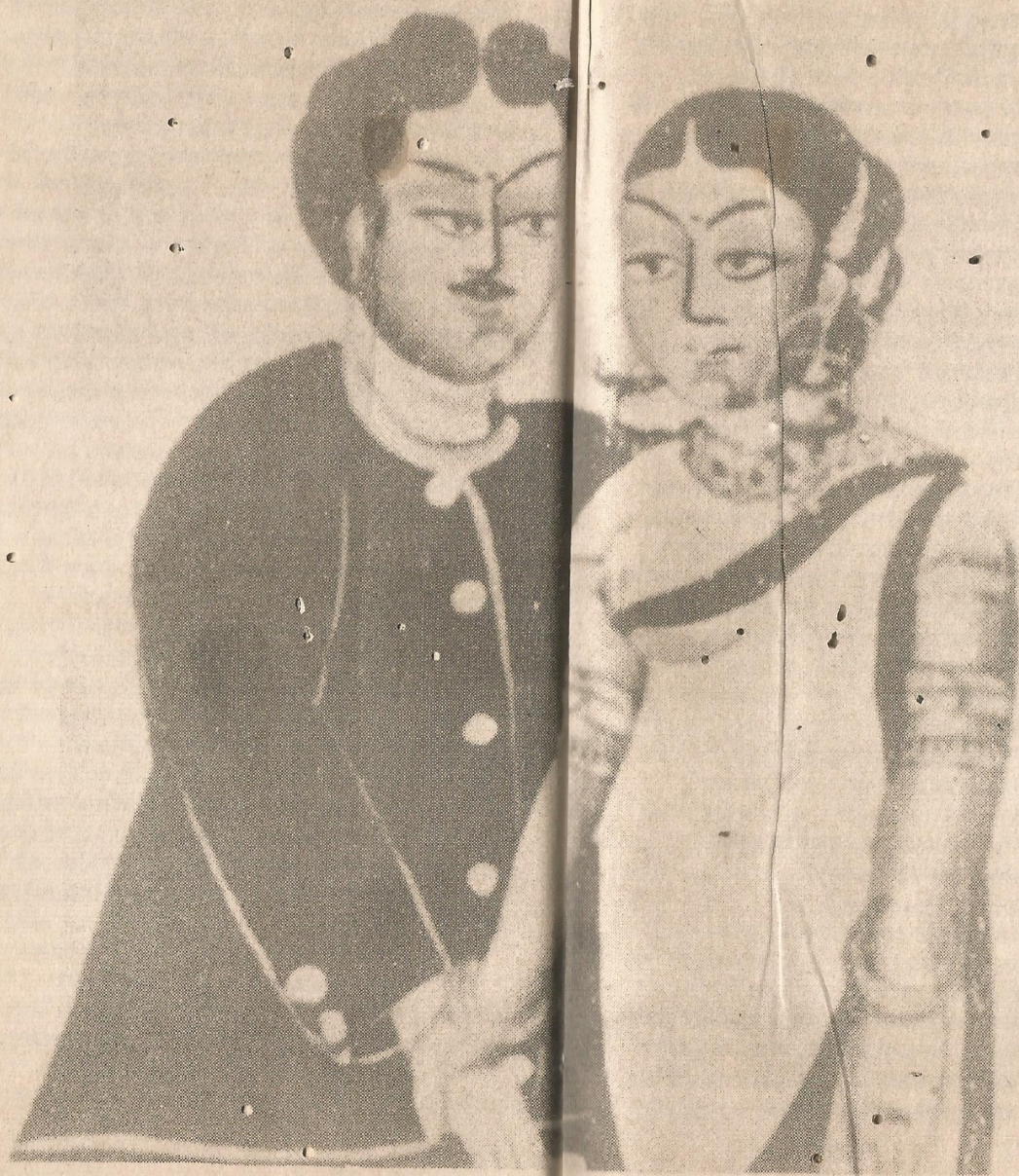
ব্যতিক্রম ছাড়া রক্ষিতা-রক্ষণ) ইত্যাদিতেও তাঁরা সমগোত্রেরই ছিলেন। আদি বাবুদের পৃষ্ঠপোষণে আঠারো শতকের শেষ থেকে যে সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল, তার সঙ্গে গ্রামীণ সংস্কৃতির ইতরবিশেষ ছিল না, নাগরিকতার যে প্রভাব পড়েছিল, সে প্রভাব ছিল নাগরিক ইতরতার। রুচি ও বৈদগ্ধ্যের কোনো বালাই ছিল না। নবকৃষ্ণ দেবের পৃষ্ঠপুষ্ট হরু ঠাকুরের খেউর ও লহর গানের 'বিদ্যা' 'গুণপনা' 'শব্দ ও অর্থের কৌশল প্রকাশে'র প্রশংসা করেও ঈশ্বর গুপ্ত অকপটে লিখেছেন : 'কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে, অতি জঘন্য, অতি ঘৃণিত, অশ্রাব্য, অবাচ্য শব্দে পূরিত হইত··· পূর্বেকার অতি প্রধান প্রধান মহিমান্বিত অর্থাৎ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর, নবকৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি উচ্চ লোকেরা এবদ্ভুত অদ্ভুত সকার বকারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন, আমোদের পরিসীমা থাকিত না। জ্ঞাতি, কুটুম্ব, স্বজন, সজ্জন, পরিজনে পরিবেষ্টিত হইয়া গদগদ চিত্তে শ্রবণ করিতেন।'[২৯] 'রাজসভাতেই' যখন এই রুচি, তখন বারো-ইয়ারী বা ইতর-জনভায় কোন রুচির পরিবেশন হতো তা সহজেই অনুমান করা চলে। 'কামিনীকুমার' জাতীয় অশ্লীল সাহিত্যে পুষ্ট হয়ে এই সাংস্কৃতিক রুচির জের চলেছিল উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত।[৩০]
কিন্তু এই সাংস্কৃতিক পরিবেশেও দ্বিতীয় স্তরের অভিজাতদের মধ্যে অনুকৃত বিলাতী রুচির অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করেছিল। বারান্দা ও করিন্থিয়ান পিলার দিয়ে বাড়ির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি, বিলাতী আসবাবপত্র, মার্বেল পাথরের মূর্তি, ইটালিয়ান মোজেকের মেঝে, দেয়ালে সাজানো অয়েল পেন্টিং, কাঁচের আলমারিতে বাঁধানো বই, বিলাতী গাড়ি ও বিলাসদ্রব্যে এক নতুন অভিজাত রুচির জন্ম হয়েছিল। বাগানবাড়ি ইয়োরোপীয় রীতিতে সাজানো শুরু হয়েছিল, হরিমোহন ঠাকুরের বাগানবাড়িতে ইয়োরোপীয় ভিলার ঢং ছিল[৩১]; রামমোহনের নিজের বাড়িতে ইয়োরোপীয় আসবাবপত্র ছিল[৩২], তিনি টেবিলে ইয়োরোপীয় খানা খেতেন।[৩৩] পানভোজনের অনুষ্ঠানে পূর্ববর্তীদের তুলনায় সংযম ও মাত্রা থাকলেও রামমোহনের ভোজসভাতে বাইজী নাচত[৩৪], দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাগানবাড়ির উদ্বোধনী ভোজসভায় 'ছুরিকাঁটার ঝনঝনির' মধ্যেও গরুর সং ঘাস 'ভক্ষণ' করে আনন্দ দিত।[৩৫] রামমোহনও 'রঙ্গিন গানের' ভক্ত ছিলেন।[৩৬]

বাবুবংশের প্রতিষ্ঠাতারা পূজা-শ্রাদ্ধ, ক্রিয়াকর্ম, পানভোজন, উৎসবাদিতে অপরিমিত অর্থ ব্যয় করতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এবং তাঁদের দ্বিতীয়-তৃতীয় পুরুষে অনেকে ব্যক্তিগত বিলাসিতা ও সৌখীনতার জন্যে অবিশ্বাস্য অংকের অর্থ ব্যয় করতেন। এই ব্যাপারে প্রতিযোগিতাও চলত। তার ফলে 'বিলাসী' 'সৌখীন' অর্থে বাবুর একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল। গোকুল মিত্র, নীলমণি হালদার, রাজা সুখময়, রাজা রাজকৃষ্ণ এই বিশেষ 'বাবু' ছিলেন। সবচেয়ে

বিখ্যাত ছিলেন হাটখোলার মদন দত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র রামতনু দত্ত ওরফে তনুবাবু। তনুবাবু বাবুত্বের যে স্ট্যান্ডার্ড দাঁড় করিয়েছিলেন, সম্ভবত পূর্বাপর কেউ তা অতিক্রম করতে পারে নি, কথায় ছিল 'বাবু তো বাবু তনুবাবু'।[৩৭] পরবর্তীকালে এই শ্রেণীর বাবুত্ব বজায় রেখেছিলেন ক্রোড়পতি রামদুলাল সরকারের পুত্র সাতুবাবু, জয়ামিত্তির এবং প্রাণকৃষ্ণ হালদারের মতো শ্রুতকীর্তি বাবুরা। বংশগত প্রতিষ্ঠা ও অফুরন্ত বৈভবের সঙ্গে মিশে তাঁদের তাকলাগানো 'বাবুগিরি' বা 'বাবুয়ানা' জনমনে এক ধরনের সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা নিন্দিত বা উপহসিত হতেন না, তারিফই যেন পেতেন। স্বভাবে ও চরিত্রে বিসদৃশ হলেও বাবুগিরিতে তাঁদের এক রকম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দ্বিতীয় স্তরের দ্বারকানাথ ঠাকুর। নিমক-এজেন্সি, জমিদারি, ব্যবসায়িক উদ্যোগ, নীলকুঠি, রেশমকুঠি, ব্যাংক, বীমা, বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠান, কয়লাখনি ইত্যাদি বিচিত্র কর্মের উদ্যোক্তা হয়েও দ্বারকানাথ 'বাবুগিরি'র জন্যেই 'প্রিন্স' হয়েছিলেন। সাতুবাবু বা প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাবুয়ানায় ছিল অহমিকা এবং বহুলাংশে উৎকেন্দ্রিক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ, রুচি হিশাবে যা বড়ই স্থূল।[৩৮] সেদিক থেকে বলা চলে, দ্বারকানাথের বাবুয়ানায় ছিল রুচি ও উপভোগের মানসিকতা। 'বিলাসী' ও 'সৌখীন' কথা দুটির সদর্থতার মধ্যে রুচি, বৈদগ্ধ্য ও সৌন্দর্যবোধের যে অনুরঞ্জন আছে, সম্ভবত তিনি তার প্রথম জন্মদাতা।[৩৯] আর এই জন্যেই তাঁর বাবুগিরিরি সঙ্গে অনুসৃত ছিল বদান্যতা ও সহৃদয়তা।
বাবুর স্পষ্ট শ্রেণীভেদ দেখা দিয়েছিল আঠারো শতকের শেষেই, যার মূলে ছিল অর্থনৈতিক স্তরভেদ। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সেই স্তর যেভাবে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল তার বর্ণনা করেছেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।[৪০] 'বিষয়ি ভদ্রলোকের ধারা' বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি চারটি স্তরের উল্লেখ করেছেন। প্রথম, 'যাঁহারা প্রধান ২ কর্ম্ম অর্থাৎ দেওয়ানি বা মুচ্ছদ্দিগিরি কর্ম্ম করিয়া থাকেন··· ; দ্বিতীয়, 'মধ্যবিত্ত লোক অর্থাৎ যাঁহারা ধনাঢ্য নহেন কেবল অন্নযোগে আছেন···' ; তৃতীয়, 'দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক তাঁহারদিগের অনেক ঐ ধারা কেবল আহার দানাদি কর্ম্মের লাঘব আছে আর শ্রমবিষয়ে প্রাবল্য বড় কারণ কেহ মেট কেহ বাজার সরকার ইত্যাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন বিস্তর পথ হাঁটিতে হয় পরে প্রায় প্রতিদিন রাত্রে গিয়া দেওয়ানজীর নিকট যেআজ্ঞা মহাশয় ২ করিতে হয় না করিলেও নয় পোড়া উদরের জ্বালা' ; চতুর্থ, 'অসাধারণ ভাগ্যবান লোক' 'ভগবানের কৃপাতে যাঁহারদিগের প্রচুরতর ধন আছে সেই ধনের বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ হইতে কাহার বা জমীদারির উপস্বত্ব হইতে ন্যায্য ব্যয় হইয়া উদ্বৃত্ত হয়···'। প্রথম ও চতুর্থ স্তর আক্ষরিক অর্থে 'বাবু', দ্বিতীয় স্তরও বাবু আখ্যাত হচ্ছেন সন্দেহ নেই। বাবু উপাধিলাভের শর্ত শিথিল হতেও শুরু করেছিল। ১৮৩১ সালের ১ অক্টোবরের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় এই

সম্পর্কিত এই মন্তব্যটি কৌতূহলজনক : 'বাবু উপাধির বিষয়ে কি কহা যাইবে ইঙ্গলণ্ডীয় উপাধি ইসক্বৈর যাঁহারদের বিপুল ধন থাকে তাঁহারদেরই হয় এমত দৃষ্ট হইতেছে কলিকাতার মধ্যে যিনি ইষ্টকনির্মিত গৃহে বাস করেন বিশেষত ঐ অট্টালিকা যদি দোতলা হয় তিনিই বাবু খ্যাতি পান। অতএব বাবু খ্যাতি প্রাপ্তি বিষয়ে কিছু অনুগম নিয়ম নাই...'। ততদিনে 'মধ্যবিত্ত লোক অর্থাৎ যাহারা ধনাঢ্য নহেন', তাঁরা নিঃসন্দেহে বাবু হয়ে গেছেন। উল্লিখিত চতুর্থ স্তরকে বলা হয়েছে 'দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক', 'বিষয়ি ভদ্রলোক'দের মধ্যে তাঁদেরও গণ্য করা হয়েছে। 'ভদ্রলোক' বললে বৃত্তি বা পেশাগত ও কৃষ্টিগত বিশিষ্টতা বোঝায়, ধনের পরিমাণের ওপরে ভদ্রলোকের সেই বিশিষ্টতার মাত্রা নির্ভর করে, দরিদ্র হলেও ভদ্রলোকের ভদ্রলোকত্ব থেকেই যায়। এই ধরনের ভদ্রলোক কি 'বাবু' উপাধি পাবেন ? বাবুর ঐতিহ্যিক শর্ত হিশাবে নিশ্চয়ই না, কিন্তু তিন দশক আগে থেকেই তাঁরাও বাবু আখ্যা পেয়ে আসছিলেন, কেরানি, মুহুরি, সরকার সকলেই তো (বিদেশীদের কাছে তো বটেই) 'বাবু'। এই বাবু-খ্যাতিতে ধনলক্ষণ বিচার্য ছিল না, ছিল ভদ্রলোকত্বের লক্ষণ। ধনহীন ভদ্রলোক অর্থাৎ নিম্নবিত্তের সংখ্যা ক্রমশই বেড়েছে, তার ফলে ক্রমশ বাবু শব্দও 'ভদ্রলোকে'র সমার্থক হয়ে উঠেছে। বাবু শব্দের প্রসারিত বিচিত্র অর্থের মধ্যে এই অর্থটি পরবর্তীকালে সবচেয়ে বেশি ব্যাপকতা লাভ করেছিল এবং আজকের দিনে বাবুর এইটেই প্রধানতম অর্থ।

বাবুর শ্রেণীভেদ, মিশ্রপ্রকৃতি ও রূপভেদের জন্য বাবুকে বিশেষিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই। প্রয়োজন আরও দেখা দিয়েছিল বাবুত্বের বিশুদ্ধতা ও অবিশুদ্ধতার পার্থক্যটি নির্দিষ্ট করতে গিয়ে। ইংরেজি শিক্ষার ক্রমপ্রসার, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের কলেবরবৃদ্ধি, প্রথাগত ও প্রথাবিরোধী আচার-আচরণ, নাগরিক প্রভাব ইত্যাদির ফলে স্বাভাবিক ভাবেই উচ্ছৃংখল ও বহুরূপী সমাজে রক্ষণশীল ও সংস্কারপন্থী উভয় দলই তখন সংযম, মাত্রা ও নৈতিকতার একটা আদর্শ খুঁজতে শুরু করেছিলেন এবং সেই আদর্শানুযায়ী প্রচারও শুরু করেছিলেন। আদর্শবোধ থেকেই প্রতিপক্ষ ও অবাঞ্ছিতদের প্রতি আঘাতের প্রয়োজন, নাগরিক পরিবেশে ব্যঙ্গ সেই আঘাতের স্বাভাবিক ও কার্যকর হাতিয়ার। অবিশুদ্ধ বাবুরা তাই ব্যঙ্গের শিকার হয়েছেন এবং তাঁদের রূপ বহু বলেই পার্থক্য বোঝাতে বিভিন্ন বিশেষণ ব্যবহার করতে হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে শেষ দশক পর্যন্ত নানা বেশে এই অবিশুদ্ধ বাবুরা লঘু-গুরু সাহিত্যে ও গুরুতর সমালোচনায় উপহাসের পাত্র হয়েছেন এবং ব্যঙ্গবিদ্রূপের বেত্রাঘাত খেয়েছেন। এই কারণে 'বাবু' শব্দটির গায়ে ব্যঙ্গের গাঢ় আস্তরণ পড়ে আছে।

 উনিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রথম বিশেষণযুক্ত বাবু হচ্ছেন

'নববাবু'। বনেদী বাবুবংশের যেসব বংশধররা পুরুষানুক্রমে বাবুত্বের স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখতে পেরেছিলেন তাঁরা নববাবু নন। পিতৃউপার্জিত বাবুত্বের জোরে শিক্ষাদীক্ষাহীন যে-বাবুরা এক পুরুষেই সীমিত পিতৃধন বাবুগিরি ক'রে উড়িয়ে দিতেন তাঁরাই নববাবু। ঐতিহাসিক বিশেষ চরিত্র হিসেবে তাঁদের কারো সন্ধান মেলে না, মেলার কথাও নয়। তাঁদের সাক্ষাৎ সাধারণীকৃতরূপে এবং তাও ব্যঙ্গসাহিত্যে। ব্যঙ্গরচনার স্বাভাবিক অতিরঞ্জন সত্ত্বেও এই নববাবুরা ঐতিহাসিক ও সামাজিক দিক থেকে 'বাস্তবিক'। নামকরণটি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এই জাতের সাধারণীকৃত বাবুদের নিয়ে তিনি লিখেছিলেন 'নববাবুবিলাস'। ভূমিকায় তিনি স্পষ্ট ক'রে বলেছেন :...

'বাবুজনস্থান... কলিকাতানামকোত্তমোত্তমরাজধানীধামবর্ত্তি ও তন্নিকটস্থ চিতপুর, খিদিরপুর, ভবানীপুরাদিস্থিত ও সুরতরঙ্গিণী সংসারপারশ্রেণী পশ্চিমতীরবর্ত্তী শালিকা, শিবপুর, চুঁচড়া শ্রীরামপুরাদি পুরস্থ অনেক অনেক বাস্তবিক বাবু সন্দর্শনে মহাহৃষ্টচিত্ত হইয়া বাস্তবিক নববাবুজনোল্লাসজনন কাল্পনিকবাবুজনগুণবর্ণন নববাবুবিলাসাভিধান গ্রন্থ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি...'।[৪১]

'ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুরের' কলকাতায় 'অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থার' কোনো একটিকে অবলম্বন করে[৪২] নববাবুদের 'পিতা কিংবা জ্যেষ্ঠভ্রাতারা' কলকাতায় 'কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি' করে 'কোম্পানির কাগজ কিংবা জমিদারি ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য' হয়েছেন, এখন তাঁরা 'বিশিষ্ট বিদ্যাযুত শ্রীযুত বাবুজনগণের সন্নিধানে স্ব স্ব নাম সম্ভ্রমাভিলাষী'। নববাবুদের শিক্ষা সেই উদ্দেশ্যে। বাংলাশিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে নামাভ্যাস, অংকাম্বর 'ফর্কিকা' ও সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ দিয়ে[৪৩]; তার ফার্সি শেখা শেষ হয়েছে দু'বছরের মধ্যে 'গোলেস্তাঁ বোস্তাঁ'-র শুরুতেই। তেরচোদ্দ বছর বয়সে ইংরেজি শেখার জন্যে 'একজন সাহেবলোককে চাকর' রাখা হয়েছে, 'গাডামী রাসকেল বেরিগুড' ইত্যাদি কথাগুলো শিখেছেন, দুএকখানা ইংরেজি চিঠি পড়তে পারেন, 'সাহেবের মত শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক উত্তর করেন'। 'এই প্রকার বিদ্যা প্রচার হওয়াতে' লেখাপড়া সাঙ্গ করে নববাবুদের বিষয়কর্মের উদ্যোগ। তখনই 'বাবুবৃক্ষের পল্লব' উদ্গম।

বাবুদের পছন্দ মতো যানবাহন পরিচ্ছদ—'পালকী পেয়াদা ছাতা পিনীশ পান্সী গাড়ি জামা-যোড়া চাপকান পাজামা, পাপেষ পাগড়ী আমামা, লাড়ুদার, মোড়াসা, চাকা বাকা ইত্যাদি'। বাবুরা গাড়ি-পালকিতে কুঠি যান, 'টালা কোম্পানি টেলর কোম্পানি'র নীলাম ঘরে যান, 'বেলা দুই প্রহর দুই ঘণ্টান্তর তিন ঘণ্টা' হলে চীনাবাজার ঘুরে বাড়ি ফিরে পোষাক ছেড়ে মিষ্টান্ন জলপান করে 'বৈঠকখানায় চমৎকৃত হস্ত পরিমিত উচ্চ গদীর উপর' বসেন, পাশবালিশে হেলান দিয়ে পিতল, রুপো কিংবা সোনা বাঁধানো হুঁকা-গুড়গুড়ি-আলবোলায় তামাক খান, পাশে 'পানের বাটা থাকেন, মধ্যে মধ্যে বামহস্তে দুই

একটা মসলা বদনে দেন, নানাবিধ খোসামুদে তোষামুদে বরামুদে বহুলে রমণীমেলক গাওক বাদক নর্ত্তক নর্ত্তকী ভণ্ডপ্রতারক এয়ার উমেদওয়ার দালাল মহাজন নবীনবাবুদিগের নাম শুনিয়া যাতায়াত' করতে থাকেন। তারপর শুরু হয় 'খলিপা'র হাতে বাবুত্বের ট্রেনিং। 'মনিয়া বুলবুলি আখড়াই গান, খোষ পোষাকী যশমী দান, আড়িঘুড়ি কাননভোজন, এই নবধা বাবুর লক্ষণ।'[৪৪] যেসব বাবু 'প'-এর চার পূর্ণ করেন তাঁরা 'হাপবাবু', 'প'-এর সঙ্গে 'খ'-এর চার যাঁদের পূর্ণ হয় তাঁরা 'ফুলবাবু'। 'প'-এর চার হচ্ছে : 'পাশা পায়রা পরদার পোষাক', আর 'খ'-এর চার হচ্ছে 'খুসি খান-কী খানা খয়রাত'। বাবুবৃক্ষে ফুল ধরল, 'ফুলবাবু অর্থাৎ বাবু ফুল হইলেন'। বাগানবাড়ি, 'রাঁড়-ভাঁড়ে'র জন্যে অর্থের প্রয়োজনে খলিপার পরামর্শে চারশ টাকা নিয়ে দালালের দস্তুরি সমেত একুশশো টাকার খত সই করতে পিছপা হন না। বাবু বাগানে পঞ্চ ম-কার যোগে 'ভৈরবীচক্র' করেন, 'বেশ্যামন্দিরে' মজা করেন, যানে কিংবা বাহনে মাহেশের স্নানযাত্রা' দেখতে যান, কখনো কুঠি যান, নিলামঘরে, চিনাবাজারে, আদালতে যান, কখন 'মেং ডেভিড হের সাহেবের দোকানঘরে গমনাগমন করেন', বাড়ি ফিরে পাঁচশো টাকায় শাল ও কাপড় কিনে আড়াইশো টাকায়, হাজার টাকায় গাড়ি কিনে চারশো টাকায় বেচে ব্যবসা করেন। তারপর 'পুঞ্জ পুঞ্জ দেনা', টাকার জন্যে স্ত্রীর গহনায় হাত। আবার গহনা চাইতে এলে স্ত্রী চুক্তি করলেন। 'তিনি কহিলেন আমি বুঝিয়াছি তোমার বড়ই টাকার দরকার হইয়াছে : কিন্তু সব দিতে পারি যদি তুমি সকলের সাক্ষাতে বল যে আমি অদ্য হইতে দুই মাসাবধি প্রতিদিন বাটীর মধ্যে শয়ন করিতেছি'।

বাবুবৃক্ষের ফল ধরল, মহাজন 'ওয়ারিন করিলেক', বাজারের যাবৎ পাওনাদাররাও নালিশ করল। কর্তাবাবু সকলের দেনা শোধ করে খালাস করে আনলেন। খালাস পেয়েই বাবু গেলেন 'প্রিয়তমা বারবিলাসিনীর' সন্নিধানে, তাঁর মাসোহারা বাকি, 'পরদিবস ছোট আদালতে দুই মাসের মাহিয়ানার দুই শত টাকার দাবিতে নালিশ করিয়া বাবুকে কাঠারায় কয়েদ করাইলেন'। কর্তাবাবু সে টাকা শোধ করে আবার খালাশ করে আনলেন। 'প্রাধানা বারাঙ্গনা' মহলে বাবুর প্রবেশ নিষিদ্ধ হল, বাবু 'বাঁশতলার গলির নিবাসিনী পতিতপাবনকারিণী দোষরমণি এক বেশ্যা' রাখলেন, 'তাহা হইতে ত্বরাতেই দুইটি বাঘের বাচ্চা লাভ হইল', বাবু ঘরেবাইরে মুখ দেখাতে পারেন না, 'সালসা তোপচিনি মারকুলি প্রভৃতি খাইয়া আরাম হইলেন'। বাবুর পিতার মৃত্যু হল, বাবু বাড়ির কর্তা হলেন, 'চাবি হস্তগত' করলেন, পিতৃশ্রাদ্ধে 'গললগ্নীকৃতবাসা' হয়ে জ্ঞাতিকুটুম্বদের সমবেত করে জাতিচ্যুতির অপবাদ খণ্ডাতে সমন্বয় করালেন। তারপর পিতৃধনে একটা বাড়ি করলেন। 'একদিবস স্ত্রী সহিত বাস' না করলেও বাবু পাঁচ কন্যার পিতা। 'কিন্তু বিবাহ না দিলে জাতিরক্ষা হয় না ক্রমে

পাঁচ কন্যার বিবাহ দিলেন, ধনের শেষ হইল পরিবার প্রতিপালনার্থ দায়গ্রস্ত হইলেন শেষে বাটীর পাটা বন্ধক কর্জ্জ সুদ সমেত অনেক টাকা দেনা হইলেন, মহাজন বাটী বিক্রয় করিয়া লইলেক আখেরে টালার বাগানে কোন ভাগ্যবানের অধিকারে বাস করিয়া কোনোরূপ দিনপাত করেন এবং পরিবার প্রতিপালনে বহু ক্লেশাবনত হইয়া বাবুগিরি ও সংস্কারের উপরি বিরক্ত হইয়া খেদ' করিতে করতে বাকি জীবন কাটালেন।

'নববাবুবিলাস'-এর সমকালে পত্রপত্রিকায় এই বাবুদের সম্পর্কে মিঠেকড়া সমালোচনা চোখে পড়ে।[৪৫] ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর মতিলালও এই গোত্রের নববাবু, তবে কিছু বয়ঃকনিষ্ঠ।[৪৬]

মতিলালের পিতা বাবুরামবাবু 'বড় বৈষয়িক ছিলেন মাল ও ফৌজদারি আদালতে অনেক কর্ম্ম করে', 'তোষামোদ ও কৃতাঞ্জলি দ্বারা সাহেব সুবাদিগকে বশীভূত' করে, 'অল্পদিনের মধ্যে প্রচুর ধন উপার্জ্জন' করেছিলেন। পেনসন নিয়ে বৈদ্যবাটির বাড়িতে বসে 'জমিদারি ও সওদাগরি কর্ম্ম' শুরু করেছিলেন।

একই ধারায় মতিলালের বাংলা ও ফার্সি শেখা, তবে ইংরেজি শিখতে সে গিয়েছে কলকাতায়, শেরবোরন সাহেবের স্কুলে দুই একদিন পড়ে কালুস সাহেবের স্কুলে ভর্তি হয়েছে। সেখানে সঙ্গদোষে মদ ও জুয়া ধরেছে, অখাদ্য খেতে শিখেছে, সেই বয়সেই পুলিশের হাতে পড়লে বাবুরামবাবু খালাশ করে বাড়ি ফিরিয়ে এনেছেন। মতিলাল দলবল নিয়ে বনভোজন, পাঁচালি, যাত্রা, বারইয়ারি, খেমটা নাচ ইত্যাদি দিয়ে বাবুত্বের তালিম দিয়েছে ; সঙ্গীরা 'সকলেই সর্ব্বদা ফিটফাট— মাথায় ঝাঁকড়া চুল—দাঁতে মিশি—সিপাই পেড়ে ঢাকাই ধুতিপরা—বুটেদার একলাই ও গাজের মেরজাই গায়—মাথায় জরির তাজ—হাতে আতরে ভুরভুরে রেশমের হাতরুমাল ও এক এক ছড়ি—পায়ে রূপার বগ্‌লসওয়াল্লা ইংরাজী জুতা··· । মতিলাল দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে; বেশ্যাবাড়ি গিয়ে 'সোর সরাবত' করে, মশারি পোড়ায়, গহনা চুরি করে, গৃহস্থ কন্যাকে ফোঁসলায়, ইলোপ করার চেষ্টা করে।

তারপর মতিলালের বিয়ে হয়, বাপের মৃত্যুর পর গদিয়ান হলে রাতদিন 'খেলাদুলা, গোলমাল, গাওনাবাজানা, হো হো হাসিখুসি, আমোদপ্রমোদ, মোয়াফেল, চোহেল স্রোতের ন্যায় অবিশ্রাম' চলতে থাকে। মতিলাল মা-ভাই-বোনকে বাড়ি থেকে তাড়ায়, সৌদাগরি করতে গিয়ে আহেলা বিলাতী জান সাহেবের 'মুৎসুদ্দি' হয় তালুক বন্ধক দিয়ে, জান কোম্পানি ফেল পড়লে জান সাহেব পালান চন্দননগরে, দলবল নিয়ে মতিলাল কিছুদিন যশোহরের তালুক দেখতে গিয়ে নীলকর সাহেবের হাতে নাকাল হয়, অবশেষে দেশ ছেড়ে পালায়।

শিবনাথ শাস্ত্রী যে 'বাবু' শ্রেণীর বর্ণনা করেছেন, তা এই জগদ্দুর্লভ, মতিলালদেরই নববাবু শ্রেণী। এদের 'বহিরাকৃতির' যে কিঞ্চিৎ বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তাও যথার্থ। কিন্তু তিনি বলেছেন : 'তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগসুখেই দিন কাটাইত।'[৪৭] সম্ভবত কথাটি সর্বাংশে সত্য নয়। তারা ভোগসুখেই দিন কাটাতো, কিন্তু প্রাচীন ধর্মকর্মে কতটা আস্থাহীন ছিল এবং সেই আস্থাহীনতা কতটা 'পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে' ঘটেছিল তা ভাববার কথা। এরা ফার্সি বা স্বল্প ইংরেজি কিছুই 'শিক্ষা' করে নি[৪৮], সুতরাং তার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাহীন হবার কারণ ঘটবার কথা নয়। ইংরেজি শিক্ষার যে পরিবেশে 'স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে' প্রাচীন ধর্মে আস্থাহীনতা এসেছিল, নববাবুদের উদ্ভবের কালে সে পরিবেশ গড়ে ওঠে নি। নববাবুদের আস্থাহীনতা তদানীন্তন কলকাতার উৎকেন্দ্রিক নাগরিক পরিবেশে অশিক্ষিত ধনী পিতাদের অশিক্ষিত সন্তানদের সুবিধাবাদী স্থূল চার্বাকী ভঙ্গিমাত্র। নববাবুরা সত্যিই কি প্রাচীন ধর্মে আস্থাহীন ছিলেন ? বাহ্যত নিশ্চয়ই না। 'আলালের ঘরের দুলাল-'এর মতিলাল সম্পর্কে বাবুরামবাবু বুঝেছিলেন : 'মতিলাল মন্দ বটে কিন্তু সে ছেলেটির হিন্দুয়ানি আছে—বোধহয় দোষে গুণে মন্দ নয়— বয়েস কালে ভারিত্ব হইলে সেরে যাবে।'[৪৯] হুতোমের বাবুকে দেখা গিয়েছে বাগানবাড়ির পোশাকেই গাজনতলায় শিবের মাথার ফুল ফেলতে যেতে হচ্ছে, চক বাজারের প্যালানাথ বাবু 'একাদশী, হরিবাসর ও রাধাষ্টমীতে উপোস ও উত্থান ও শয়নে নিজ্জলা করে থাকেন', বাবুরা বিভিন্ন পাল-পার্বণ-ক্রিয়াকর্মও যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে করছেন। নববাবুদের পরেই যে বাবুশ্রেণীর আবির্ভাব হয় সেই শ্রেণীই প্রকৃতপক্ষে 'স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে'র ফল। ১৭৭৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট স্থাপনার পর থেকে অনেক বাঙালী সম্ভ্রান্ত ঘরে ইংরেজি শেখার রীতি শুরু হয় ইংরেজি-জানা বাঙালি ও ফিরিঙ্গি গৃহশিক্ষকদের মাধ্যমে। পরে জোড়াসাঁকোয় শেরবোরন, আমড়াতলার মার্টিন বৌল, আরাতুন পিত্রুসের স্কুলেও কিছু কিছু বাঙালী ছাত্র ইংরেজি শিখেছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে ইংরেজি শিক্ষার সূচনা হয় ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে। প্রকৃত বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশও এই সময় থেকে। মুখ্যত ধনী ও সম্পন্ন মধ্যবিত্তের সন্তানদেরই হিন্দু কলেজে শিক্ষার সুযোগ থাকলেও অ-ধনাঢ্য ও 'দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক', এমন কি অতি-দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত পরিবারের সন্তানেরাও শিক্ষার সুযোগ নিতে তৎপর হয়েছিলেন। অপেক্ষাকৃত মিশ্রশ্রেণীর এই ছাত্ররা যে কারণেই ইংরেজি শিক্ষা করতে যান না কেন, ইংরেজির মাধ্যমে তাঁরা বেকন, লক, হিউম, বার্কলে, ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট, রেইড প্রভৃতি মনীষীদের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হন, যার ফলে একদল বাঙালী তরুণের মনোরাজ্যে বিপ্লব ঘটে যায়। তাঁরা প্রচলিত ধর্ম,

লোকাচার, রীতিনীতি সবকিছুর পুরোপুরি বিরোধী হয়ে দাঁড়ান, অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কারকে আঘাত করে যুক্তিবাদের সরব প্রবক্তা হয়ে পড়েন। তাঁরা ইয়ং বেঙ্গল এবং গুরু ডিরোজিওর জন্যে ডিরোজিয়ান (এবং ইয়ং ক্যালকাটান) নামে পরিচিত। তাঁরা স্বাধীন চিন্তার প্রথম দাবিদার এবং প্রথম খাঁটি বাঙালী বুদ্ধিজীবী। সাহসে, সততায়[৫০], বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে, চিন্তার বলিষ্ঠতায়, চারিত্রিক দৃঢ়তায় ইয়ং বেঙ্গল পূর্বাপর তুলনারহিত। তাঁরা বিরুদ্ধবাদীদের তীব্র ক্রোধ, নিন্দা, অভিসম্পাতের পাত্র ছিলেন, ব্যঙ্গবিদ্রূপের পাত্র ছিলেন না। তাঁরা কখনো 'বাবু'গোত্রভুক্ত হন নি, তাঁরা এক সাময়িক প্রচণ্ড আন্দোলনের স্রষ্টা ; তাঁরা একটা স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীমাত্র ছিলেন।[৫১] কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার প্রথম আস্বাদের উত্তেজনায়, তারুণ্যের চপলতায়, আঘাত দেবার উগ্র মানসিকতায় তাঁরা আচার-আচরণের এমন কিছু-কিছু অভিনব দৃষ্টান্তের সৃষ্টি করেছিলেন, যা সম্পন্ন পরিবারের ইংরেজি শিক্ষাভিমানী স্বল্প ও অর্ধশিক্ষিত বহু সন্তানের অনুকরণের লোভনীয় বস্তু হয়েছিল, তাঁদের উন্মার্গগামিতার মানসিকতাকে পুষ্ট করেছিল। কেউ কেউ হিশাব করে বলেন, ১৮১৭ থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে ১৩ বছরে, অন্তত (হিন্দু কলেজের) ১০০০-১২০০ ছাত্র শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছে ধরা যেতে পারে।[৫২] শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া ছাত্রের সংখ্যা এত বেশি হওয়া সম্ভব নয়। ১৮৩০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারির সমাচার চন্দ্রিকায় ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞদের সংখ্যাবৃদ্ধি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে : 'এক্ষণে কলিকাতা নগরে স্বীয়ভাষার তুল্য ইঙ্গরেজী ভাষাভিজ্ঞ শতাবধি দুইশত যুবা মহাশয়দিগকে দর্শায়ন যায়।'[৫৩] হিশাবে সাধারণ ছাত্রসংখ্যা ১২০০ যদি হয়ও, শিক্ষা সম্পূর্ণ-করা ছাত্রের সংখ্যা নিঃসন্দেহে কম হবার কথা। এই ছাত্রদের বেশির ভাগের শিক্ষাই ছিল অসম্পূর্ণ। ১৮২৮ সালে হিন্দু কলেজ ছাড়াও কলকাতার অন্যান্য স্কুলের ইংরেজি পাঠার্থীর মোট সংখ্যা 'এক হাজারের ন্যূন' ছিল না।[৫৪] কিন্তু স্কুলে যা শিক্ষা হতো তা কখনোই সম্পূর্ণ শিক্ষা হতে পারে না। তাই বলা চলে, ইয়ং বেঙ্গলদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হবার সমকালে স্বল্প-ইংরেজি-শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিতদের সংখ্যা ছিল অনেক গুণে বেশি। এই ধরনের স্বল্প বা অর্ধ ইংরেজি শিক্ষার মান কী ছিল তা সমকালীন পত্রপত্রিকায় অভিভাবকেরা ব্যক্ত করে গেছেন।[৫৫] এই সব স্বল্প ও অর্ধশিক্ষিতদের কাছে হিন্দু কলেজের বয়স্ক প্রতিভাবান ছাত্রদের আচার-আচরণ আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত ছিল। পরবর্তীকালে সেটা তাদের অনুকৃত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তাঁরা এক নতুন বাবুশ্রেণী গড়ে তুলেছিলেন, যাঁদের নাম দেওয়া হয়েছে 'নব্য বাবু'।

এই নব্যবাবু শ্রেণী গড়ে উঠেছে 'জাবনিক রুচিভক্ষণ', কালীঘাটের কালীকে 'গুড মর্নিং ম্যাডাম' বলা, গঙ্গাজল নিয়ে শপথ করতে অস্বীকার করার পরিবেশে।

নব্যবাবুদের মদ্যাসক্তিকে অনেকে ইয়ং বেঙ্গলদের প্রভাব বলতে চান। 'সে সময়ে সুরাপান কুসংস্কার-ভঞ্জনের একটা প্রধান উপায় ছিল। যিনি শাস্ত্র ও লোকাচারের বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে সুরাপান করিতে পারিতেন, তিনি সংস্কারকদলের মধ্যে অগ্রগণ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন।' এই মন্তব্য করে শিবনাথ শাস্ত্রী তো খোদ রামমোহনের ঘাড়েই 'সুরাপান শিক্ষা বিষয়ে সহায়তা'র পরোক্ষ দায়িত্ব চাপিয়েছেন।[৫৬] কিন্তু অভিজাত বাবুমহলে মদ্যপান গোড়া থেকেই অত্যন্ত ভালোভাবেই চালু ছিল, তাঁদের বংশধরেরা ঐতিহ্য হিশাবেই সেটা পেয়েছিলেন। তবে বাবু ও নববাবু মহলে মদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল না, মদ ছিল অন্যতম নেশা। যেমন, বাগানবাড়ির ফুর্তির আসরে একই সঙ্গে বিভিন্ন নেশা চলছে : 'কড়া দোক্তা ভেলসা অম্বুরি গাঁজা খায় কেহ চরস খায়··· কেহ বলে মেদরা বুঝি অল্প আসিয়াছিল হিঙ্গন বিবি বসাক বাবু এই দুই জনে সকলি খাইল, কেহ ঘরে ঢুকিল কার্ক খুলিয়া সরাপ ছয়লাপ করিল···।'[৫৭] মদ্যপান আভিজাত্য ও সম্পন্নতার অন্যতম লক্ষণ ছিল, গ্রামের ধনীরাও মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন।[৫৮] উৎসবে, ভোজসভায়, ক্রিয়াকর্মে বনেদী বড় মানুষেরা মদ্যপানে বেএক্তিয়ার হতেন। রামমোহন, দ্বারকানাথেরা প্রকাশ্যভাবে 'পরিমিত সুরাপান' চালু করেন নি, তাঁরা প্রকাশ্য মদ্যপানে পরিমিতি আনার চেষ্টা করেছিলেন, প্রচলিত জীবনাচরণের অতিরেকের বহু ক্ষেত্রে যেমন তাঁরা সংযম ও মাত্রা আনতে চেষ্টা করেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখেরা সেই পরিমিতি আজীবন রক্ষা করেছিলেন। মদ্যপানকে তাঁরা রুচিসম্মত উপভোগের, আনন্দ ও 'সুখের' অন্যতম উপকরণ বলে মনে করতেন। কেবল অভিজাতরা নন, কলকাতার সম্পন্ন ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাও মদ্যাভ্যস্ত ছিলেন। রাজনারায়ণ বসু বা মধুসূদন দত্তের পিতারা হিন্দু কলেজের শিক্ষায় মদ ধরেন নি। তবুও নৈষ্ঠিকতার বিচারে সমাজে মদ্যপান গর্হিত কাজ ছিল, মদ্যপানে শাস্ত্রীয় নিষেধ ছিল, আচারনিষ্ঠ 'ভদ্রলোক' সম্প্রদায়ের কাছে মদ্যপান এক ধরনের 'ট্যাবু' ছিল। এই 'ট্যাবু'কেই ইয়ং বেঙ্গল কুসংস্কার ও ভণ্ডামি বলে ভাবতেন, এটাকে ভাঙার জন্যে তাই এমন সরব প্রকাশ্য মহড়ায় নেমেছিলেন। তাঁরা আর একটা কাজ করেছিলেন। দেশীয় অনেক রীতিনীতির মতো গাঁজা-চরস ইত্যাদি দেশীয় নেশাগুলোকে ভদ্রসমাজে অপাংক্তেয় করে দিয়েছিলেন। বিলাতী ধ্যানধারণার মতো নেশার রাজ্যেও বিলাতী মদের একচ্ছত্র আধিপত্য ঘটিয়েছিলেন, নেশায় কৌলীন্য এনেছিলেন। নব্যবাবুদের নেশার তালিকায় তাই বিভিন্ন বিলাতী মদ ছাড়া অন্য আর কোনো নেশার স্থান ছিল না। মদের আধিপত্য ও কৌলীন্যের পেছনে সরকারী আবগারি নীতি[৫৯], সুলভতা, আস্বাদ ও ক্রিয়ার উৎকর্ষও কাজ করেছিল নিশ্চয়ই। এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আর্থিক অবস্থাও তখনকার দিনে যথেষ্ট সচ্ছল হয়েছিল। তবে একথা সত্য যে, শিক্ষিত ও

শিক্ষাভিমানীর মধ্যে মদ্যপানের অতিপ্রসার ইয়ং বেঙ্গলদের প্রভাবের ফল। তাঁরা মদ্যপানকে শিক্ষিতের 'কারণ' করে তুলেছিলেন। 'ট্যাবু' ভেঙে মদ্যপান হয়েছিল একটা 'ফেটিশ'।
মদের সঙ্গে সঙ্গে খানা-খাওয়া ছিল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। খানার রীতি বনেদী বাবুমহলে আঠারো শতকের শেষ থেকেই চালু হয়েছিল। খানার উপকরণ ছিল প্রধানত নিষিদ্ধ মাংসে প্রস্তুত রসনাতৃপ্তিকর ভক্ষ্যদ্রব্য। দুর্গোৎসবে, অন্যান্য ভোজসভায় সাহেবমনিবদের আপ্যায়নের জন্যে বিলাতী খানার চল হলেও, বাবুমহলে তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল।[৬০] ভোজসভার বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ্যভাবেই এই খানার ঘোষণা করা হতো।[৬১] রামমোহন, দ্বারকানাথরা এই ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন এবং নববাবুরা তা বজায় রেখেছেন তাঁদের স্টাইলে। সম্ভবত রামমোহনই গোমাংস ভোজনের প্রথম প্রকাশ্য সমর্থক[৬২], ইয়ং বেঙ্গলদের কেউ কেউ তাঁর অনুবর্তী। মদের মতো বিলাতী খানায় শিক্ষিত সম্পন্ন মধ্যবিত্তেরাও অভ্যস্ত ছিলেন। মদের মাত্রা কমানোর জন্যে রাজনারায়ণ বসুকে তাঁর পিতা নন্দকিশোর বসু হোটেলের উপাদেয় খানার লোভ দেখাতেন।[৬৩] 'হুপুর গুন্টর' ও 'উইলসনে'র বিল যোগাতেন সম্ভবত বাঙালী অভিজাত ও মধ্যবিত্তরাই বেশি। নৈষ্ঠিকতার বিচারে তখনকার দিনে 'অন্নের বিচারই ধর্মের কাষ্ঠাভাব ছিল'; ইয়ং বেঙ্গল মহাকোলাহলে সেই 'কাষ্ঠাভাব'কে আঘাত করেছিলেন। নিষিদ্ধ খাদ্যভোজনকে তাঁরা যুক্তির উপরে দাঁড় করিয়েছিলেন। নব্যবাবুরা সেই যুক্তিই কপচাতেন, আর সেই সঙ্গে কপচাতেন কানে-শোনা ইয়ং বেঙ্গলের 'রিফর্ম', 'ফ্রিডম-লিবার্টি'র হাস্যকর সুবিধাবাদী বুলি।

কিন্তু নব্য বাবুদের বেশ্যাসক্তিটা মোটেই ইয়ং বেঙ্গলদের প্রভাব নয়, এটি বাবুত্বের ঐতিহ্য। ১৮৭৩ সালে রাজনারায়ণ বসু বলেছেন: 'সেকালে লোক প্রকাশ্যভাবে বেশ্যা রাখিত। বেশ্যা রাখা বাবুগিরির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত; এক্ষণে তাহা প্রচ্ছন্নভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু সেই প্রচ্ছন্নভাবে তাহা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার প্রমাণ বেশ্যাসংখ্যার বৃদ্ধি।'[৬৪] বেশ্যাগমন (বাবুদের ভাষায় 'মজা করা') বৃদ্ধির কারণ শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধি, মফস্বলের সংগতিপন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের শিক্ষিত হবার বাসনায় কলকাতায় অবস্থান, চাকরিজীবী মধ্যবিত্তের ক্রমবৃদ্ধির ফলে নব্য বাবুদের দলপুষ্টি। বাবুত্বের ঐতিহ্য বয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়াও বেশ্যাগমনের চাহিদা ও যোগানের অন্য সামাজিক (অর্থনৈতিকও) কারণ ছিল।[৬৫] নব্য বাবুদের অর্থসংগতি ছিল তুলনায় সীমিত, মাসিক এক হাজার টাকায় নিকীকে 'চাকর' রাখা[৬৬] বা নান্নীজানকে ভোজসভায় মুজরো দেওয়া তাঁদের স্বপ্নেরও অতীত, রক্ষিতার জন্যে দোতলা-তিনতলা বাড়ি বানিয়ে বড়মানুষী দেখানো খুবই কষ্টসাধ্য,

সিকদারপাড়ার 'পয়োধরী' বা 'নিতম্বিনী' বা সোনাগাছির 'সুঁটকো কাঞ্চনকে' হাতে রাখতেই তাঁরা গলদঘর্ম। আগের বাবুদের মতো প্রকাশ্য রক্ষিতালীলা শিক্ষিতের কাছে নিন্দনীয় এবং রুচি হিশাবে স্থূলও বটে। প্রকৃত শিক্ষিতের মধ্যে ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, নৈতিকতা, 'সুরুচি'র ঢেউ জেগেছে। এইসব কারণে বেশ্যাগমনে 'প্রচ্ছন্ন ভাব' এসেছে। আগের বাবুদের মতো নব্য বাবুদের দাঙ্গাহাঙ্গামা করার নির্বোধ সাহস নেই, স্ত্রীলোকসংগ্রহে 'মহাদায়গ্রস্ত' মোসাহেবদের 'জানবাচ্চা এক গাড়' করার হুমকি দেবার মতো দাপটও নেই।[৬৭] শিক্ষাভিমানী ভদ্র নব্য বাবুরা ব্যাপারটায় রোমান্সের রং ধরাবার চেষ্টাতেও মন দিয়েছেন, 'স্ত্রীশিক্ষা' 'স্ত্রীজাতির উদ্ধার' ইত্যাদি সংস্কারাত্মক বোলচাল দিয়ে বন্ধুবান্ধব-পরিচিতজনের অন্তঃপুরে উঁকি মারতে শুরু করেছেন। নব্য বাবুদের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে গিরীশচন্দ্র ঘোষ এই বিশেষত্বটির স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।[৬৮] নব্য বাবুদের এই বিশেষত্বটি প্রায় একটা ব্যাধির মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যা প্রচুর প্রহসনের বিষয়বস্তু হয়েছে, এবং যা স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার পক্ষপাতী নৈষ্ঠিকদের শিরঃপীড়ার কারণ ঘটতো। অনাত্মীয়ের সঙ্গে স্ত্রীকন্যাকে পরিচিত করার ব্যাপারে সেই শিরঃপীড়া যে কেমন হাস্যকর মানসিকতার চেহারা নিয়েছিল তার চরম দৃষ্টান্ত সম্ভবত শিবনাথ শাস্ত্রী বর্ণিত বৃদ্ধ রামতনু লাহিড়ী-প্যারীচাঁদ মিত্র সংবাদটি।[৬৯]
মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) প্রহসনের নবকুমার, কালী, 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'-র (১৮৬২) দনু মিত্তির, দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'-র (১৮৬৫) অটলবিহারী, নকুলেশ্বর, নিমে দত্ত নব্য বাবুদের মোটামুটি যোগ্য প্রতিনিধি। নবকুমার বিত্তবান বৈষ্ণব পিতার 'কালেজে' পড়া একমাত্র সন্তান, ঘরে স্ত্রী বর্তমান, যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষিত কেতায় তৈরি জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার 'সদ্দার আর মনি ম্যাটারে··· বিশেষ সাহায্য করে', সেখানে চেয়ারটেবিলে সাজানো ঘরে ইংরেজি কেতায় 'কোরম্' হলে সভা শুরুর প্রস্তাব তুলে 'মোসন সেকেণ্ড' করে সকলের সম্মতি নিয়ে 'চ্যারমান প্রোপোজ' করা হয়। নবকুমার 'সুপারস্টিশনের শিকলি কাটা'র, 'সোসীয়ল রিফর্মেসন', 'মেয়েদের এজুকেট করা', বিধবাবিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে 'ইস্পীচ' দেয়; ব্রাণ্ডি, বিয়ার, তামাকের শ্রাদ্ধ করে পয়োধরীর খেমটা গান ও নিতম্বিনীর নাচের 'মজা' লুটে, হোটেলের খানাসাজানো 'সপর টেবিলে' দলবল নিয়ে বসে; চিরাচরিত বাবুনিয়মে মাতাল হয়ে বাড়িতে ফেরে। মোসাহেব কালী স্পষ্ট পরিচয় দেয়: 'আমি
বিএরের—মুখটি—স্বকৃতভঙ্গ—সোণাগাছিতে আমার শ্বশুর—না না শ্বশুর নয়—শত শাশুড়ির আলয়, আর উইলসনের আখড়ায় নিত্য প্রসাদ পাই।'[৭০]

'চোরবাগানের দনুকর্ণ মিত্তির বাবুর বাপ, ন্যাটড্রাইব মনকিসন

কোম্পানির বাড়ির মুচ্ছদ্দী ছিলেন, এ সওয়ার চোটা ও কোম্পানির কাগজেরও ব্যবসা কত্তেন। দনুবাবু কালেজে পড়েন, একজামিন পাশ করেছেন, লেকচর শোনেন ও মধ্যে মধ্যে ইংরাজি কাগজে আর্টিকেল লেখেন... একজামিন পাশ কর্বার পূর্ব্বে দনুকর্ণ বাবু চার ছেলের বাপ হয়েছিলেন ও প্রথম মেয়েটির বিয়ে পর্যন্ত হয়ে গিছ্‌লো।' (হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, পৃ ৩৪, ৩৫)। স্কুলফ্রেন্ডদের নিয়ে দনুবাবুর নেশার দৌড় ছিল পুরনো চরস, মাজমের বরফী, সিদ্ধি পর্যন্ত, শেরি 'শ্যামপিনের' আস্বাদের জন্যে তিনি বাড়িতে বন্ধুদের হাতে 'সমরভেকশনে' দীক্ষিত হলেন। 'ক্রমে ব্রান্ডি অন্তর্ধান হলেন। এদিকে বাবুদের মেজাজও গরম হয়ে উঠলো ; দোর, জানলা খুলে দেওয়া হলো ; চেঁচিয়ে হাসি ও গর্‌রা চলতে লাগলো। শেষে শেরিও সমীপস্থ হলেন, সুতরাং ইংরাজি ইস্পিচ ও টেবিল চাপড়ানো চল্লো—ভয় লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গেলো' (ঐ, পৃ ৩৫)। দনুবাবুর বাপ তাড়না করতে গিয়ে 'ইয়ংবেঙ্গালি' ঘুসি খেয়ে ঘুরে পড়লেন, তিরস্কৃত দনুবাবু রোরুদ্যমানা জননীকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন : 'মা, বিদ্যেসাগর বেঁচে থাক। তোমার ভয় কি। ও ওল্ড ফুল মরে যাক না কেন, ওকে আমরা চাইনি ; এবারে মা এমন বাবা এনে দেবো যে, তুমি, বাবা ও আমি একত্রে বসে হেলথ (ড্রিংক) করবো, ও ওলড ফুল মরে যাক, আমি কোয়াইট রিফরমড বাবা চাই।' (ঐ, পৃ ৩৫-৩৬)।

'সধবার একাদশী'-তে নব্য বাবুসম্প্রদায়টির অনেকেরই সাক্ষাৎ মেলে। অটলবিহারী 'অনেকের সর্ব্বনাশ করে বিষয়' করা ধনী বৈষ্ণব পিতার একমাত্র সন্তান, যে 'এক ব্যাটা বড় মান্‌সের ছেলে মদ ধরলে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়', 'গৌরমোহন আড্ডির স্কুলে দুই একখান বুয়ের পাতা উলটে' পরে হেয়ার স্কুলে 'বাবুজ্ কেলাশে' মাসকতক বিদ্যা, কিন্তু সেক্‌সপিয়র 'কোট' করতে যায়, মেঘনাদবধকাব্যের সমালোচনা করে ; তিনশো টাকা মাসোয়ারায় রক্ষিতা কাঞ্চনের জন্যে দুতিন মাসে ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে, 'ঘরের মাগ বেরয়ে গেলেও' তার মুখ হেঁট হয় না, রক্ষিতা বন্ধুর বাগানে গেলে মুখ হেঁট হয়, মাগের আনুকূল্যে বাড়িতেও রক্ষিতার অবস্থান হয় ; সুরাপান নিবারণী সভার সভ্য হতে বললে 'বেহ্ম সভায় নাম লেখাব' বলে বাপকে ভয় দেখায়, আত্মীয়-পত্নীকে জোর করে বার করে আনতে পিছপা হয় না। মূর্খ, শিক্ষাভিমানী, মদ্যপ, লম্পট, অভব্য পিতৃধনভোগী অটলবিহারী নব্য বাবুর যথার্থ প্রতিনিধি। বন্ধু নকুলেশ্বর হাইকোর্টের উকিল, চতুর ও হিশাবী, মদ্যপ কিন্তু সুরাপাননিবারণী সভার সভ্য ও প্রবক্তা, বাগানবাড়িতে বন্ধুর রক্ষিতাকে নিয়ে আসতে দ্বিধা নেই। নিমে দত্ত গৌরমোহন আড্ডির স্কুলে পড়েই ইংরেজিতে তুখোড়, প্রকৃত শিক্ষিতের রুচি, নীতিবোধ, সদ্বংশের পুত্র ও জামাতা হয়েও সঙ্গপ্রভাবে মূর্খ ধনীসন্তানের ইয়ার এবং একরকম 'খলিপা'। এরা ছাড়া নব্য বাবুর আর একটি রূপ

ঘটিরাম ডেপুটি ; কালেজে পড়ে বিদ্বান, মফস্বলের হাকিম, তিন চারখানা ডিক্‌সনারি না হলে তরজমা করতে পারেন না, ব্রাহ্মসমাজের (মফস্বলের) সম্পাদক, মদ-মুরগি-মুসলমানের দোকানের বিস্কুট কোনো কিছুতেই 'প্রেজুডিস নাই', 'ব্রাহ্ম হঁলেও হিন্দুদের মন রক্ষার জন্য ঠাকুর দেখতে গিয়ে ঝনাৎ করে টাকা ফেলে দিয়ে প্রণাম' করে ; 'অর্ধচন্দ্রের' ভয়ে ঘুস খায় না, স্কুল করার টাকা দেয়, বেশ্যালয়ে যাওয়া পাপ বললেও কাঞ্চনের বাড়ি গিয়ে তাড়া খায়।

মাইকেলের নবকুমার, কালী প্রভৃতি সদ্যাবির্ভূত নব্য বাবুদের সরলীকৃত নমুনা, ১৮৩৩ সালের পর থেকে যাদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। তখনো রূপভেদের তেমন বৈচিত্র্য দেখা দেয় নি, দীনবন্ধুর নব্য বাবুদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় আরও এক দশক পর থেকে। তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পর্বে (১৮৪৬ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত) ইয়ং বেঙ্গলরা রঙ্গমঞ্চ থেকে অপসৃত হয়ে গিয়েছিলেন, অর্থকরী ইংরেজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার ফলে 'অপ্রগাঢ়বিদ্যাসম্পন্ন' লঘুচিত্তের দল বৃদ্ধি হচ্ছিল, পুনর্জীবিত ব্রাহ্মধর্ম-স্ত্রীশিক্ষা-বিধবাবিবাহ ইত্যাদি ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন শিক্ষিত সমাজে আলোড়ন তুলেছিল ; কলেজে-পড়া অর্ধশিক্ষিত 'প্রেজুডিস'-হীন কেনারামরাও 'ঘটিরাম ডেপুটি' হচ্ছিল ; ভোলানাথ, বাঙাল রামমাণিক্যের দল কলকাতার নব্য বাবুদের দলপুষ্ট করছিল। স্বাভাবিকভাবেই দীনবন্ধু নব্য বাবুদের রূপভেদগুলোর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'-র প্রকাশ কাল ১৮৬২ সাল, কলকাতার আদি বনেদী বাবুদের জন্মের ঠিক একশো বছর পরে। নক্‌শাখানি যেন বাবুর শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ ! অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ধারাপথে বাবুবংশের গোত্র-কুল-শীল-মর্যাদার যে বিচিত্র রূপভেদ ঘটেছে এতে তার বিশ্বস্ত পরিচয় আছে। ১৮৬২ সালের দিকে 'সে কালের' আদি বাবুদের কীর্তিকাহিনী কিংবদন্তী-প্রবাদের পর্যায়ে উঠে গেছে ; তাঁদের ৩য়-৪র্থ পুরুষেরই বয়স হবে ৬০-৬৫ ; নববাবুদের পিতৃদেবের, দ্বিতীয় স্তরের 'বড় মানুষ কবলানো' বাবুদের বয়স হয়েছে ৮০ (বাবু পদ্মলোচন দত্ত, পৃ ৮৪-৯৮) ; নববাবুদেরও ৬০-৬৫ ; ইয়ং বেঙ্গলরা (১৮৩০ সালে গড়ে ১৭ বছর ধরলে) ৫০ ছুঁয়েছেন, কি ছাড়িয়েছেন ; নব্য বাবুদের ঊর্ধ্বসীমা ৪০ থেকে ৪২। নক্‌শায় 'পূর্ব্বের বড় মানুষদের' কাহিনীসমেত সকল জাতের বাবুরই সাক্ষাৎ মিলছে এবং এতে রকমারি বাবুর পরিবেশ, আচার-আচরণের (বিশেষ করে মদ্যপান লাম্পট্যের) যে বিস্তারিত বর্ণনা আছে, সমকালীন গুরুতর পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় তার সমর্থন মিলবে।[৭১] '১২১৯ সালে সারবর্‌ন সাহেবের নিকট তিন মাস ইংরিজি লেখাপড়া' শেখা মুসলমানী কেতার নববাবু (চকবাজারের বাবু প্যালানাথ, পৃ ২৪), বনেদী বংশের উত্তর পুরুষের বাবুরা (চড়কের বাবু, পৃ ১-৩ ; রাজা অঞ্জনারঞ্জন দেব

বাহাদুর, পৃ ৩৭), পাড়াগেঁয়ে জমিদারবাবু (পৃ ৮), হঠাৎ বাবুদের সঙ্গে নব্য বাবুদের একাধিক রূপভেদ—ব্রাহ্মবাবু, ইয়ং বেঙ্গল, ইংরেজি কেতার বাবু ইত্যাদি রকমারি বাবুর ভিড়, তবে নব্য-পূর্ববর্তী বাবুদের সমাবেশ বেশি।

ইয়ং বেঙ্গলকে দেখি বারইয়ারির সঙে খুবই সরলীকৃত রূপে ;[৭২] ইংরেজি কেতার বাবুর দুটি দলের পরিচয় আছে—'প্রথম দল 'উঁচুকেতা সাহেবের গোচরের বস্ত'। দ্বিতীয় 'ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ'। প্রথম দলের সকলি ইংরাজি কেতা, টেবিলচেয়ারের মজলিশ, পেয়ালা করা চা, চুরট, জগে করা জল। ডিকান্টরে ব্রাণ্ডী ও কাচের গ্লাশে সোলার ঢাক্‌নি, সালু মোড়া—হরকরা, ইংলিশমান ও ফিনিক্‌স সামনে থাকে, পোলিটিক্‌স ও বেষ্ট নিউজ অব দি ডে নিয়েই সর্ব্বদা আন্দোলন। টেবিলে খান, কমোডে হাগেন এবং কাগজে পোঁদ পোঁচেন। এঁরা সহৃদয়তা, দয়া, পরোপকার, নম্রতা প্রভৃতি বিবিধ সদ্গুণে ভূষিত, কেবল সর্ব্বদাই রোগ, মদ খেয়ে খেয়ে জুজু, স্ত্রীর দাস,—উৎসাহ, একতা, উন্নতীচ্ছা একেবারে হৃদয় হতে নির্ব্বাসিত ; এঁরাই ওল্ড ক্লাস !—দ্বিতীয়ের মধ্যে—বাগাম্বর মিত্র (এঁকে সম্ভবত চিনতে পারা যায়) প্রভৃতি সাপ হতেও ভয়ানক, বাঘের চেয়েও হিংস্র ; বলতে গেলে এরা এক রকম ভয়ানক জানোয়ার।... পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে আপনার গোঁপে তেল দেওয়াই এদের পলিসী।' (পৃ ৯)। 'বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন' সঙে[৭৩] যাঁদের দেখানো হয়েছে, আর কিছুকালের মধ্যেই তারা নব্য বাবুর অতিপরিচিত টাইপ হয়ে দেখা দিয়েছেন। এছাড়া আছে 'রকমারি বড় মানুষ', যাঁরা 'সিভিলিজেসনের অনুরোধে চড়ক হেট করেন। কেউ কেউ নিজে ব্রাহ্ম হয়েও 'সাত পুরুষের ক্রিয়াকাণ্ড' বলেই চড়কে আমোদ করেন ; বাস্তবিক তিনি এতে চটা, কী করেন, বড় দাদা, সেজো পিশে বর্ত্তমান—আবার ঠাকুমার এখনো কাশীপ্রাপ্তি হয় নাই।'[৭৪] (পৃ ৭-৮)।

একশো বছরে বনেদী বাবুত্বের বনিয়াদ একেবারে ধ্বসে গেছে, বাবুত্বের রসদ ফুরিয়ে গেছে ; বছর কুড়ি-বাইশ আগে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের মতো বাবুরা নোট জাল করেও সে রসদ আর সংগ্রহ করতে পারেন নি, 'হরিণবাড়ি' গিয়ে, সম্পত্তি নীলামে তুলে দিয়ে শোচনীয়ভাবে বাবুলীলা সাঙ্গ করেছেন ; ১৮৫৬ সালে ক্রোড়পতি রামদুলালের পুত্র, ঘোড়দৌড়, 'বুলবুলাখ্য পক্ষীর যুদ্ধ'-খ্যাত, দলপতি-গোষ্ঠীপতি সাতুবাবুর অন্তিম চিকিৎসার ডাক্তারের বিল মামলা করে আদায় করতে হয়েছে।[৭৫] বিত্ত ও বিদ্যার জোরে এবং মুখ্যত বিদ্যার বলে বিত্ত অর্জনের জোরে যাঁরা সমাজের উঁচুতে উঠেছেন, তাঁরা শতবর্ষের পুরনো প্রথাগত সাম্মানিক কৌলীন্যের উপাধি বাবু আখ্যায় ভূষিত হলেও, বাবুত্বের মোহ থেকে বহুলাংশে মুক্ত। শিক্ষিত সমাজে বাবুর

কৌলীন্য নষ্টপ্রায়, বাবু ক্রমশ উপহসিত, নিন্দিত ও অতি অবজ্ঞেয় পাত্র। বাবুর কুলীন অকুলীন গোত্রভেদ আর সম্ভব হয়ে উঠছে না। পত্রপত্রিকায় গুরুতর সামাজিক আলোচনায় বাবু বলতে নিন্দিত সামাজিক শ্রেণীকেই নির্দিষ্ট করা হচ্ছে।[৭৬] পুরনো বাবুর ঐতিহ্য বয়ে চলেছে নব্য বাবুদের বিচিত্র রূপভেদেরে মধ্যে দিয়ে।

•

সময় হিশাবে নির্দিষ্ট করতে গেলে নব্য বাবুদের বিচিত্র রূপভেদের কাল মোটামুটি ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্বদ্যিালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে। তার আগেই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মূল উপজীবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল চাকরি। কিন্তু সে চাকরির ক্ষেত্রেও রীতিমতো সমস্যা দেখা দিয়েছিল, চাকরির সীমিত ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তবুও একমুখী উচ্চাশায় শহর ও গ্রামের মধ্যবিত্তশ্রেণী চাকরির উদ্দেশ্যে ইংরেজিশিক্ষার জন্যে ক্রমশই হন্যে হয়ে উঠছিল। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে বছরে গড়ে এন্ট্রান্স পাশের সংখ্যা ৬৪০, পরের বছর থেকে বি· এ· পাশের সংখ্যা ৬২ ; ১৮৬১ থেকে এফ-এ· ও এম· এ পাশের সংখ্যা যথাক্রমে ১৭৭ ও ১৭।[৭৭] ইংরেজি শিক্ষা যেমন আর্থিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে চাকরির, তেমনি সামাজিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মর্যাদার ছাড়পত্র। কিন্তু উচ্চশিক্ষা ব্যয়সাধ্য। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া দুরূহ ছিল। ফলে তাদের শিক্ষার মান কী হওয়া সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। অথচ শিক্ষাভিমান ও আনুষঙ্গিক দোষগুলো পুরোপুরি ধাতস্ত হয়ে গিয়েছিল। উচ্চশিক্ষিতের পক্ষে ভালো চাকরি সম্ভব না হলেও ডাক্তারি, ইনজিনিয়ারিং, ওকালতি, মাস্টারির পথ খোলা, কিন্তু অর্ধশিক্ষিতের পক্ষে খোলা ছিল কেবলমাত্র সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অমর্যাদাকর নিম্নপদের কেরানিগিরি কিংবা উঞ্ছবৃত্তি। অল্পবিদ্যা, লঘুচিত্ততা, সেইসঙ্গে পুরনো পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না-পারার অক্ষমতার জন্যে যে মানসিক উন্মার্গগামিতার সৃষ্টি হচ্ছিল, তাতে বাবু সম্প্রদায় পুষ্ট হয়ে বিচিত্র রূপ ধারণ করছিল। নব্য বাবু সম্প্রদায়ের রূপভেদকে চিনবার ও চেনাবার জন্যে নতুন নতুন বিশেষণের প্রয়োজন হয়েছিল। এই সময় থেকেই তাই আবার রকমারি নামের বাবুর সাক্ষাৎ মেলে। সপ্তম দশকের প্রথম দিকে ব্যঙ্গপ্রবণ সমাজ-সমালোচক বাবুত্বের সাধারণ লক্ষণ নির্দেশ করেছেন এইভাবে :[৭৮] ১) 'ইংরাজী স্কুল বা ইংরাজী প্রণালীর বাংলা বিদ্যালয়ে পড়িতে হইবে। কতকাল বা কতদূর পড়া—তাহার নিশ্চয়তা নাই। দিনকতক ও পাতকতক পড়িলেই যথেষ্ট' ; ২) 'পাকা ধরণে, বাঁকা টোনে, একেলে উচ্চারণে' অশুদ্ধ বাংলার সঙ্গে ভেজাল দেওয়া ইংরেজি বুলি অভ্যাস ; ৩) সংগতি থাক না থাক, 'ইংরাজী জুতা, পীরাণ, চীনাকোট, ফিরানো চুল, পায়ে হাফমোজা, হাতে ষ্টিক একটা চাইই চাই।'[৭৯] উঁচু ধরনের সাহেব হতে

গেলে 'জ্যাকেট, পেন্টুলন, চেন ঘড়ী, নাকে চশমা, চাঁপ দাড়ী, চুরোট, শীশ, কুকুর, ড্যাম, হুট ইত্যাদি' প্রকরণ চাই ;[৮০] ৪) সেকহ্যান্ড, নমস্কার-প্রণামে ঘৃণা, বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণদের প্রতি উপহাস, খবরের কাগজের বাতিক, 'সভাটভার নামে রোমাঞ্চ', কেবল স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা, অগ্নিমান্দ্য, ভ্রমণে ক্লেশ ইত্যাদি আবশ্যিক ; ৫) কুলবৃত্তিত্যাগ, স্ত্রীকে 'হাঁড়ি ছুঁতে না দেওয়া'— রাঁধুনি রাখা বা মা-বোনকে দিয়ে সে কাজ সারা ইত্যাদি।

বেশ বোঝা যায়, বাবুত্বের লক্ষণগুলো নিছক মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্তের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে চলেছে, বিত্তাশ্রয়ী বাবুত্বের দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে। ইংরেজি শিক্ষার ফলে জাগ্রত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রূপ নিয়েছে স্থূল স্বার্থপরতায় ও আত্মসুখে। 'প্রগ্রেসিব বাবু'র লক্ষণে বলা হয়েছে : 'যে যত বাপের মনে দুঃখ দিতে পারিবে, সে তত 'প্রগ্রেসিব' বাবু হইবে।' 'স্বাধীন বাবু' লক্ষণ : 'বাবার পরিবার বাবা পুষুন, আমার পরিবার আমি পুষি' এই বিলাতী 'পোলিটিক্যাল ইকনমি'মূলক লোকযাত্রা-নির্বাহতত্ত্বের অনুগামী' যে যত হতে পারবে সে তত স্বাধীন বাবু। স্বাধীন বাবুরা ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়ে স্বাধীনতার ভক্ত, সুতরাং তাদের স্বাধীন হতে হবে. কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাবার উপায় নেই—'কেননা ইংরাজের মত এদেশে পার্লামেন্ট স্থাপনের প্রস্তাব করিতে গেলেই 'কিকিং' বই আর কিছুই লাভ হইবে না !—সংবাদপত্রে কিংবা পুস্তকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন অভিপ্রায় প্রকাশের যো নাই—কেননা এখনই ছোটকর্ত্তা শ্রীঘরে পাঠাইতে পারেন।… অথচ স্বাধীনতার ব্যতীতও প্রাণ হাঁপায় !' এ অবস্থায় বুড়ো বাপ-মার উপরে স্বাধীনতার সাধ মেটাবার ভার। এছাড়া বহুপরিচিত 'ফুলবাবু' : 'নির্দ্দোষা যোষা সহধর্মিণীদের মনে যে যত দুঃখ দিতে সমর্থ হইবে, সে তত ফুলবাবু শিরোমণি হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর বাবুদের অগম্যাগমন ও অপেয়পান, এই দুইটি প্রধান গুণ। অধুনা এ দেশে এ শ্রেণীর বাবু যত, অন্য কোনো শ্রেণীর বাবু তত দেখা যায় না।' আগেকার দিনে ফুলবাবু হওয়া কষ্টসাধ্য ছিল, 'প' এবং 'খ'-এর মোট আট পূর্ণ করতে হতো, ভূয়োদর্শী 'খলিপা'র ট্রেনিং লাগত. এযুগে 'দু'য়েই ফুলবাবু উপাধি হচ্ছে, পাশ করা অনেক সোজা হয়ে গেছে। এই 'ফুলবাবু' বোঝাতে বাবু শব্দের একটি বিশেষ অর্থ বাংলায় স্থায়ী হয়ে আছে।[৮১]

এ যুগে রকমারি বাবুদের ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণে চিহ্নিত করা হলেও, উপলক্ষণগুলো সুস্পষ্ট নয় ; উপলক্ষণগুলো সাধারণ লক্ষণেরই অন্তর্ভূত। 'প্রগ্রেসিব বাবু', 'স্বাধীন বাবু', 'ফুলবাবু' সবাই মিলে এযুগের অখণ্ড বাবু। তথাকথিত ইংরেজিশিক্ষিত ক্রমবিস্তৃত বাঙালী মধ্যবিত্তের মানসিকতা ও জীবনচর্যার নঞর্থক সমগ্র দিকটিই অখণ্ড বাবুত্বের লক্ষণাবলির মধ্যে বিধৃত।[৮২] বাবু আর শ্রেণীবিশেষ নয়, যেন সাধারণভাবে গোটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই প্রতিরূপ। বাবুত্বের

বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থীদের উত্তরপুরুষের ফারাক-জনিত বিরক্তি, ক্ষোভ, রোষ ও সাধু-ইচ্ছার পিতৃসুলভ ব্যঙ্গবিদ্রূপের বেত্রাঘাতের দিন এখন আর নেই। পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফল লাভ করে, যুক্তিবাদ, উদারতা, মানবতা, ব্যষ্টি-সমষ্টির কল্যাণবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে, যাঁরা ধর্ম-সমাজ-শিক্ষার সংস্কারের মধ্যে দিয়ে সমাজ ও জাতির একটা পরিচ্ছন্ন, সামঞ্জস্যপূর্ণ, নীতিনিষ্ঠ, ভদ্র রূপ দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, যাঁদের মধ্যে জেগেছে স্বদেশিকতা, জাতীয়তা, স্বাধীনতার বর্ণাঢ্য কল্পনা-মূর্তি, তাঁরা সকলেই এই বাবুত্বের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধর্মযুদ্ধের সেনাপতি, তাঁর আঘাত বেত্রাঘাত নয়, যদুবংশ-নিপাতের মুষলাঘাত। বঙ্কিমচন্দ্র বাবু শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট করেছেন এইভাবে :

...বাবু শব্দ নানার্থ হইবে।... (ইংরেজদের) নিকট 'বাবু' অর্থে কেরাণী বা বাজারসরকার বুঝাইবে। নির্ধনদের নিকটে 'বাবু' শব্দে অপেক্ষাকৃত ধনী বুঝাইবে। ভৃত্যের নিকট 'বাবু' অর্থে প্রভু বুঝাইবে। এ সকল হইতে পৃথক্, কেবল বাবুজন্ম-নির্ব্বাহাভিলাষী কতকগুলিন্ মনুষ্য জন্মিবেন।[৮৩]

বঙ্কিমের চোখে তথাকথিত শিক্ষিত গোটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীই 'বাবুজন্মনির্ব্বাহাভিলাষী'। এই শ্রেণীই সমাজের 'ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর'; 'বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহাদেরও দশ অবতার—যথা কেরাণী, মাষ্টার, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকিল, হাকিম, জমিদার, সম্বাদপত্রসম্পাদক এবং নিষ্কর্ম্মা।' শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সম্ভাব্য সমস্ত পেশাই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র এই বাবুর আকার-প্রকার, রূপ-গুণ, বিদ্যা-বুদ্ধি, রুচি-সংস্কৃতির সামগ্রিক বর্ণনা করেছেন, যা বাংলাদেশের বাবুত্বের বিবর্তিত বিচিত্র লক্ষণাবলির যোগফল। শিক্ষিত বাঙালী বলতে সাধারণভাবে যা বোঝায় 'বাবু' তার প্রতিশব্দ :

যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তক মধ্যে, যৌবনে বোতল মধ্যে, বার্দ্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু। যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাহ্মধর্ম্মবেত্তা, বেদ দেশী সংবাদপত্র এবং তীর্থ 'ন্যাশনাল থিয়েটার', তিনিই বাবু। যিনি মিসনারির নিকট খ্রীস্টিয়ান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু, এবং ভিক্ষুকের নিকট নাস্তিক, তিনিই বাবু। যিনি নিজগৃহে জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান, এবং মুনিবগৃহে গলাধাক্কা খান, তিনিই বাবু। যাঁহার স্নানকালে তৈলে ঘৃণা, আহারকালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা, এবং কথোপকথন কালে মাতৃভাষাকে ঘৃণা, তিনিই বাবু। যাঁহার যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, ভক্তি কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীতে, এবং রাগ কেবল সদ্‌গ্রন্থের উপরে, নিঃসন্দেহ তিনিই বাবু।'[৮৪]

এই মেরুদণ্ডহীন, বহুরূপী, পরানুকারী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীকেই[৮৫] ইংরেজ প্রভুরা ভদ্রতা করে সদর্থক বিশেষণ দিয়ে আখ্যাত করেছিল :

'The pliable, plastic, receptive Baboo of Bengal...'।[৮৬] কিন্তু তদানীন্তন শিক্ষিত ভদ্র বাঙালী মধ্যবিত্তের সদর্থক লক্ষণগুলো একত্র করলেও যে চরিত্র আত্মপ্রকাশ করে তাও ছিল 'অসার', 'আশাশূন্য', 'প্রয়োজনশূন্য', মহৎ কোনো আদর্শের ধারণশক্তি তার ছিল না। ইংরেজের অনুগ্রহধন্য দেওয়ান- বেনিয়ান-মুৎসুদ্দি প্রতিষ্ঠিত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শাঁসে-জলে পরিপুষ্ট, ইংরেজি শিক্ষার পরিচর্যায় বর্ধিত বাঙালী বাবুবংশের উত্তরপুরুষের গড়-পড়তা চরিত্রের নঞর্থক দিকটি এতই প্রকট ছিল যে, উনিশ শতকের মধ্যভাগের বাংলা সাহিত্যে তা শুধু ব্যঙ্গ-প্রহসন ও নিছক লঘু সাহিত্যের খোরাকই জুগিয়েছে;[৮৭] বাংলা ব্যঙ্গ-প্রহসনের চরিত্রগুলোকে গড়-পড়তার নিচের বাঙালী চরিত্র ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই। বঙ্কিমচন্দ্র বা রমেশচন্দ্রের উত্তেজিত ভাব-কল্পনার কোনো 'প্রোটাগনিস্ট' বাঙালী সদর্থক গড়-পড়তার উর্ধ্বেও ছিল না। তাঁরা নিরুপায় হয়ে তাই ঐতিহাসিক রোমান্স-উপন্যাসের মধ্যেই উত্তেজনার ভার লাঘব করেছেন। গড়-পড়তার উর্ধ্বে সদর্থক-নঞর্থক দুই জাতের বাবু বাঙালী চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'-এর নগেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর গোবিন্দলাল; দেবেন্দ্রনাথ নিজেই মরেছে, নগেন্দ্রনাথকে বঙ্কিম মরতে বলেছেন,[৮৮] গোবিন্দলালা আত্মহত্যা করেছে।[৮৯] একশো বছরের প্রাচীন বাবু বংশের চিতাশয্যায় বঙ্কিম আনুষ্ঠানিকভাবে মুখাগ্নি করেছেন।

প্রসঙ্গ নির্দেশ

১· নামবিচার

১· H. Yule—A. C Burnel: Hobson-Jobson ; জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস : বাঙ্গালা ভাষার অভিধান ; হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় শব্দকোষ ; বিশ্বকোষ ১২শ খণ্ডে শব্দটিকে 'দেশজ' বলা হয়েছে ; রাজশেখর বসু চলন্তিকা-য় ও কাজী আব্দুল ওদুদ ব্যবহারিক শব্দকোষ-এ শব্দটির বুৎপত্তি নির্দেশ করেন নি ।

২· ফার্সি 'বাবু' শব্দের অর্থ : 'A kind of wandering monk'.—F. Steingass ; অপর একটি অর্থ— 'ঈশ্বরপ্রিয়, ভগবদনুগৃহীত, প্রকৃত জ্ঞানী, যার সদ্‌গুণের সুবাস বা যশের বিস্তার আছে । বা (সহিত) + বু (সৌগন্ধ্য) । যশসৌরভযুক্ত ।'—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস । এটি পৃথক শব্দ । এই শব্দটির আক্ষরিক অর্থানুযায়ী গল্প চালু আছে যে, বাংলা দেশ থেকে যেসব উকিল জাতের প্রতিনিধিরা মোগল দরবারে যেত, তারা আমীর-ওমরাহদের টেক্কা দিয়ে বেশি করে আতর ব্যবহার করত, তাই ঠাট্টা করে তাদের 'বাবু' বলা হতো ।

৩· 'পদ্মা বলে বাবু তুমি সংসারে সার ।'—বিজয়গুপ্ত : মনসামঙ্গল । লিপিকর-প্রমাদ না হলে এখানে বাবু=পিতা । আনুমানিক ১৬২০-১৬৩৭ সালের মধ্যে নেপালে লেখা গোপীচন্দ্রনাটক-এ 'বাবু' শব্দের প্রচুর প্রয়োগ । (গোপীচন্দ্রনাটক, তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পা· কঃ বিঃ, ১৯৭০) । মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি : 'আহা বাবু আমি কাঙ্গার জোগি রাজার সনে কার্জ নাহি বাবা ।'—পৃ ২৯ । কোতোয়ালের প্রতি : 'কি পুছসি বাবু করিগায়ি' ; 'তারও কাজ নাহি বাবু ক্লিঙ্গায়' ; 'বাবু কলিঙ্গা' ; পৃ ৩২, ৩৭, ৩৮ । দম্ভপরায়ণ রাজকর্মচারীর প্রতি : 'অহা ভাগীখোর বাবু এমত্ত অহংকার না করো ।'—পৃ ৩৮ । একই অর্থে সর্বত্র 'বাবা' ও 'বাবু' প্রযুক্ত হয়েছে, এবং সর্বত্র সম্বোধনে যোগী জালন্ধরীপাদের মুখে । রাজাকেও সম্বোধন করা হয়েছে 'বাবু গোপীচন্দ্র' (পৃ ৪৯) । নাটকে বাবা=বাবু-র অর্থ—সন্তান, বৎস, ক্ষেত্রবিশেষে অব্যয় । 'বাপু' শব্দ একবার মাত্র (পৃ ৪২) ; পিতা অর্থে বাপ : 'তোমাকে অধিক ছিলো তোমার বাপেরো রূপ' (পৃ ২২) ; 'তুমারা বাপের শক্তি নাহি' (পৃ ৩৮) ।
'বাবা' অর্থে বাবুর প্রয়োগ আলালের ঘরের দুলাল-এ আছে । বেণীবাবু মতিলালকে বলেছেন : 'বাবু কোথায় গিয়েছিলে ।'—সাহিত্য-পরিষৎ সং, পৃ ৯ ।

৪· *Chamber's Twentieth Century Dictionary.*

৫· 'Its application as a term of respect is now almost or altogether confined to lower Bengal (though C. P. Brown states that it is also used in S. India for 'Sir', 'My Lord', 'Your 'Honour').—*Hobson-Jobson*

৬· সম্ভবত প্রথম বলেছেন দুর্গাচরণ রায় 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' বইতে, ডাচ কোম্পানির দেওয়ান শ্যামরায় সোম প্রসঙ্গে : 'ইনি নবাব সিরাজউদ্দৌলার নিকট 'বাবু' উপাধি লাভ করেন।' (পৃ ৩৯৪, ২য় সং)। তাঁরই অনুসরণে বলেন প্রমথনাথ মল্লিক : 'বাবু তখনকার সম্মানসূচক উচ্চ কর্ম্মচারীর পদবী ছিল।'—কলিকাতার কথা, আদি কাণ্ড, পৃ ১৫২। হরিহর শেঠ লিখেছেন : 'সিরাজদ্দৌলার সময়ে 'বাবু' একটি উপাধি ছিল।' তিনি শ্যামরাম সোমের সঙ্গে কলকাতার মুক্তারামবাবুকেও যোগ করেছেন।—প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়—কথায় ও চিত্রে, পৃ ৪০০, ১৯৫২। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস : বাঙ্গালা ভাষার অভিধান দ্রষ্টব্য।

৭· সরকারী খেতাব হিশাবে 'বাবু বাহাদুর' উপাধি দিতে শুরু করেছিল কোম্পানি সরকার উনিশ শতকের মধ্য ভাগ থেকে, কিন্তু খুবই কম সংখ্যায়। ১৮৭১ সালের ১ জানুয়ারি সুলভ সমাচার থেকে জানা যায়, সে সময়ে এদেশে ১২ জন মহারাজা, ১৯ জন রাজা বাহাদুর, ১৪ জন রাজা, ৭ জন কুমার, ২৩ জন রায় বাহাদুর, ৪ জন খাঁ বাহাদুর, ২ জন সিম, ৭১ জন সর্দার, ৪ জন নবাব বাহাদুর ও ১ জন বাবু বাহাদুর ছিলেন।

৮· 840. Petition of Natives of Calcutta against hanging a man for forgery (Proceedings January 29)—Rev. J. Long: *Unpublished Records of Govt.*

৯· ত্রৈমাসিক 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া', ১ম সংখ্যা, ১৯২০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, (২য় খণ্ড, ৩য় সং, পৃ ৭৪০) গ্রন্থে উদ্ধৃত।

১০· প্রমথনাথ মল্লিক : কলিকাতার কথা, আদি কাণ্ড, পৃ ২৪১।

১১· 711. From Raja Tillokchand to the Council—Rev. J. Long : *Unpublished Records etc.*

১২· সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ ৩৯, ৪০, ২৭৮। এঁরা নিঃসন্দেহে উচ্চপদস্থ কর্মচারী। এঁদের মধ্যে পরানচন্দ্র/প্রাণচন্দ্র কর্পূর ছিলেন মহারাজা তেজচন্দ্রের রানী কমলকুমারীর ভ্রাতা, রানী বসন্তকুমারী ও তেজচন্দ্রের পোষ্যপুত্র মহাতাবচাঁদের পিতা। রাজশ্যালক হয়ে হীনাবস্থার প্রাণচন্দ্র কর্পূর হন উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রাণচন্দ্রবাবু বা পরান/পরানচাঁদবাবু। এই পদবিতেই তিনি সুপরিচিত, কালে তিনি হন সর্বময় কর্তা দেওয়ান। স্বরচিত 'হরিহরমঙ্গল সংগীত'-এ তিনি লিখেছেন : 'প্রাণচন্দ্রবাবু প্রসিদ্ধ খ্যাতি। দেওয়ান আখ্যান দিলা ভূপতি ॥' উচ্চস্তরের বিশেষ পদের কর্মচারী ব্যতীত সরকারীভাবে নামের আগে 'বাবু' যোগ রাজবাড়ির রীতি ছিল না। গেজেটেড-ননগেজেটেড গোছের পার্থক্যসূচক বাবুযুক্ত ও বাবুবিহীন কর্মচারীদের নেমপ্লেট শেষদিন পর্যন্ত বসানো থাকত।

১৩· 819. To Lord Clive, from Set Oodweichand and Coosaulchand, *Unpublished Records etc.*

১৪-১৫· *Hobson-Jobson*. বিষ্ণুপুর মল্লরাজবংশে রাজার পরবর্তী সহোদর 'হিকিম' এবং অন্যরা 'বাবু' অভিহিত হতেন।

১৬· সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃ ২৬৫।

১৭· 963. (Select Committee, January 16) A. D. 1767. 'Lord Clive recommending Nobokissen, Moonshee to the protection of the Committee...'—Rev. J. Long : *Unpublished Records etc.*

১৮· 'কান্তবাবু' উল্লেখ আছে সমকালীন ছড়া বা গানে। ১৭৭৫ সালে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে নন্দকুমারের অভিযোগের ব্যাপারে কাউন্সিলের সামনে কান্তমুদির অনুপস্থিতি স্মরণীয় ঘটনা। তা নিয়ে রচনা : 'কান্তবাবু হয়ে কাবু হাবুডুবু খায়। তুড়ুং লাগানো হোক ক্লেভারিং-এর রায় ॥ হেষ্টিংস যাহার হাত তারে করে কাবু। বাংলায় হেন লোক আছে কে হে বাবু ॥' নবকৃষ্ণ, কাশীনাথ, গঙ্গাগোবিন্দ, দেবী সিং ও কান্তমুদি—কোম্পানি তথা হেস্টিংসের একান্ত বশংবদ যে ৫ জন তখনকার দিনে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কান্তমুদি ছিলেন সম্ভবত সবচেয়ে বড় ভুঁইফোড়। বিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠলেও অন্যদের মতো 'দেওয়ান' বা 'মুন্সি' গোছের কোনো কর্মগত পদবি তাঁর ছিল না। কদাচিৎ তিনি হেস্টিংসের 'বেনিয়ান' বলে অভিহিত। অনেক পরে ১৮২৪ সালে গভর্নমেন্ট গেজেটে কান্তবাবু হেস্টিংসের 'দেওয়ান' উল্লিখিত হয়েছেন (The Days of John Company-1824—1832, p.p. 6)। তাঁর পুরো নামের উল্লেখও পাওয়া যায় না। বাবুত্বের 'স্টেটাস' লাভ করলে এহেন ব্যক্তি 'মুদি' পদবিটি বাদ দিয়ে যে বাবুযুক্ত হবেন, এটাই স্বাভাবিক ; এবং এভাবেই বিশিষ্টার্থে 'কান্তবাবু' নামটির প্রতিষ্ঠা ও লোকমুখে প্রচলন। 'কান্তবাবু' বাবু কৃষ্ণকান্ত নন্দীর লোকপ্রচলিত নামকরণ ; এই নামই সরকারীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, অন্যদের ক্ষেত্রে এ ধরনের নাম ব্যবহারের প্রয়োজন হয় নি। কান্তমুদির 'কান্তবাবু' নামকরণের পেছনে লোকমানসের প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গপ্রবণতাও হয়ত অস্বীকার করা যায় না।

১৯· ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩), এক্ষণ, বিশেষ ক্রোড়পত্র, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৭৪।

২০· আঠারো শতকের শেষে ও উনিশ শতকের প্রথমে বাবুযুক্ত নামের আর এক কৌতূহলজনক দৃষ্টান্ত 'নিধুবাবু'। অর্থ, প্রতিপত্তি, বাড়ি, মদ্যাসক্তি, রক্ষিতা—বাবুত্বের বিবিধ সরঞ্জাম নিধুবাবুর ছিল। নবকৃষ্ণ প্রমুখদের আসরে তিনি 'বাবু' হিশাবেই মর্যাদা পেতেন, তিনি কালী মির্জার মতো কোনো বাবুর পারিষদ বা অন্য কোনো ওস্তাদের মতো বেতনভুক বা পেশাদার ছিলেন না সংগীতের ক্ষেত্রে বা প্রসঙ্গে অন্যান্য গায়ক থেকে তাঁর মর্যাদাসূচক বিশিষ্টতা নির্দেশ করতে রামনিধি গুপ্তকে 'নিধুবাবু' বলাই স্বাভাবিক। তাঁর গানের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে নিধুবাবু নামটাই অতি পরিচিতি লাভ করেছিল। শেষটায় এমন হয় যে, গানবাজনার প্রসঙ্গে 'বাবু' বললেই নিধুবাবুকে বোঝাতো। 'কি সধন কি অধন সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তিই নিধুবাবুকে 'বাবু' শব্দে সম্বোধন করিতেন। বাবুর বাটী, বাবুর সুর, বাবুর গীত, বাবু এলেন, বাবু গেলেন ইত্যাদি।'—কবিজীবনী : ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, ১৯৫৮, পৃ ১১৫। এইরকম সমকালীন বিশ্বনাথবাবু ওরফে বিশে ডাকাতের নামটিও উল্লেখযোগ্য। (ফাঁসি হয় ১৮১৮ সালে)। তখনকার দিনের সংবাদপত্রে এবং পরবর্তীকালের গ্রন্থাদিতে তিনি বিশ্বনাথবাবু নামে অভিহিত। '...

মোং কৃষ্ণনগর জেলাতে অনেক ডাকাতি জমা হইয়াছিল তাহাদের

সরদার বিশ্বনাথবাবু নামে এক দুরন্ত ডাকাতি ছিল… ।'—সমাচার দর্পণ, ১৫ মে, ১৮১৯ । 'প্রায় ৬০ বৎসর অতীত হইল, বিখ্যাত ডাকাইত বিশ্বনাথবাবু এই স্থানে (ডুমুরদহে) বাস করিতেন ।'—দুর্গাচরণ রায় : দেবগণের মর্ত্যে আগমন, পৃ ৩৭৬ । বিশ্বনাথবাবু ডুমুরদহের সম্ভ্রান্ত বনেদী রায়বংশের সন্তান, সুতরাং বাবু উপাধি তাঁর বংশগত ; ডাকাত হলেও এই বংশগত বিশিষ্টতা বোঝাতেই বাবুর ব্যবহার । বাবুযুক্ত নামের সাক্ষাৎ এ সময়ে আরও গোটা কয়েক মেলে । ১৮২২ সালে ২৬ জানুয়ারি প্রধান বিচারপতি হাইড ইস্টের বিদায় উপলক্ষে 'সুখ্যাতিপত্রে স্বাক্ষরকারী' ব্যক্তিদের মধ্যে 'মতিলালবাবু', 'বিশ্বনাথবাবু', 'জগন্নাথদাসবাবু' আছেন । অনুমান করি, প্রথম দুজন অবাঙালী ; তৃতীয়জন মনে হয় জগন্নাথ দাসবর্মন, দেওয়ান কাশীনাথের বংশধর এবং অবাঙালী । বাবুযুক্ত নাম স্বাক্ষর কোনো বাঙালী সম্ভ্রান্তের ক্ষেত্রে নজির আছে বলে মনে হয় না ।

২১· 'At that time (i.e. 1761) and for 50 years afterwards there were few Natives qualified even as copyist. The Portuguese were consequently the Keranis of the day.'—Rev. Long : *Unpublished Records etc.*, পাদটিকা, পৃ ৩৪৫ ।

২২· 'It is the peculiar title (i.e. Babu) of that nefarious class who lend money to the young writers !'—A. Fraser Tylers : *Considerations on the Present Political State of India, 1815—Glossary* । উল্লিখিত ৪ জন বেনিয়ান সম্পর্কে হিকির মতামত ও অভিজ্ঞতা কৌতূহলজনক ।—বিনয় ঘোষ : সুতানুটি সমাচার (হিকির আত্মকথা) দ্রষ্টব্য ।

২৩· কেরানি রামরতন (রামরত্ন) চক্রবর্তীর একটি চমৎকার ইংরেজি কবিতা হিকি তাঁর স্মৃতিকথায় স্থান দিয়েছেন, রামমোহন মজুমদারের উল্লেখ করেছেন সপ্রশংসভাবে ।

২৪· '…the immense convent like mansions of the more wealthy 'Baboos…' Heber i. 31, ed. 1844. *Hobson-Jobson* দ্রষ্টব্য ।

২৫· 'Baboo, an appelation, given to a rich native or to any one whom we wish to show respect.'—A. Fraser Tylers : *Considerations etc.*, Glossary.

২৬-২৭· পঞ্চানন মণ্ডল : চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, ২য় খণ্ড ।

২৮· Sibratan Mitra : *Types of Early Bengali Prose*, C. U.

২৯· কিছুটা কৌতুক করে প্রায় একশো বছর পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই আপসের রীতি সম্পর্কে বলেছেন : '… হিন্দু-মুসলমান এবং ইংরাজী তিন সভ্যতার উপাদান একত্র হইয়াছে, আঘাত না করিয়া সন্ধি করিয়াছে ।… যেমন হিন্দু মতে পূর্বে নামের আগে 'শ্রীযুক্ত' লেখা হইত ; মুসলমান-আমলে আসিলেন 'বাবু' । যখন কোন ব্যক্তিকে যথেষ্ট রূপ সম্মান দেখাইতে হইত, তখন তাঁহাকে লেখা হইত 'শ্রীযুক্ত বাবু' । তারপর ইংরাজী মতে আসিল 'Mr.' এবং 'Esquire. । শেষোক্ত কারণে এখন Mr. বা Esquire ই প্রযুক্ত হয় । হিন্দু 'শ্রীযুক্ত' এবং মুসলমান 'বাবু' একত্র মিলিয়া মিশিয়া ছিল ; মিষ্টারও এমনি ভাবে মিশিয়া 'শ্রীযুক্ত বাবু মিষ্টার অমুকচন্দ্র অমুক এস্কোয়ার' হইতে পারিত, কিন্তু ইংরাজেরা

আসিয়াই 'বাবু'কে অত্যন্ত অনাদর ও ঘৃণা করিতে লাগিলেন, তাই 'বাবু' অভিমানে গা ঢাকা দিয়াছেন ;'—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, পৃ ৬৩-৬৪, প্রকাশ ১৩২৬ । কৌতুকাবহ হলেও এই হিন্দু-মুসমান-ইংরেজি আপসরীতি কিন্তু ইংরেজদের ক্ষেত্রে বাংলা সংবাদপত্রে বহুশঃ প্রযুক্ত হয়েছে, যেমন শ্রীযুক্ত মেং বকিংহাম সাহেব, শ্রীযুত মেং গরডন সাহেব ইত্যাদি । হিন্দু-মুসলমান আপসরীতি, যেমন শ্রীযুত হের সাহেব, শ্রীযুত হারিত্তন সাহেব, প্রায় বিধিবদ্ধভাবে গৃহীত হয়েছে । '… শ্রীযুক্ত বাবু' শিরোনামে এখনকার দিনে কখনও পরিত্যাগ করা যায় না । কেবল অধ্যাপক, গুরু, পুরোহিত প্রভৃতিকে লিখিতে 'বাবু' শব্দ ত্যাগ করিতে হয় ।… মুসলমানকেও বাবু লেখা নিষিদ্ধ ।'—বঙ্কিমচন্দ্র : সহজ রচনাশিক্ষা ।

৩০· সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড ।

৩১· 'কালে সংবাদপত্রের বহুল প্রচলন ও রাজপুরুষগণ কর্তৃক প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হওয়া প্রযুক্ত দেশশুদ্ধ বাবু হইয়া উঠিলেন ।'—মধ্যস্থ, ১২৮০ সন ।

৩২· সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃ ৩৪ ।

৩৩· সংবাদ প্রভাকর ২২· ২· ১৮৪৭

৩৪· 'বাবু সম্বোধন ছেলেবেলায় আমরা শুনি নাই, এটা ইংরাজী পড়ার দরুন হয়েছে ।'—মহেন্দ্রনাথ দত্ত : কলিকাতার পুরাণ কাহিনী ও প্রথা, ১৯৭৩, পৃ ৯ ।

৩৫-৩৬· সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড ।

৩৭· সংবাদ ভাস্কর, ৩১ মে, ১৮৪৯ ।

৩৮· বেঙ্গল স্পেক্টেটর, ৮ মার্চ, ১৮৪৩ ।

৩৯· সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ ভাস্কর, সোমপ্রকাশ ইত্যাদি (বিনয় ঘোষ সম্পাদিত সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড(।

২· গোত্রবিচার

১· ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত হুতোম পেঁচার নক্শা (১৩৬৩), পৃ ১ ।

২· শুকদেব মল্লিক, শোভারাম বসাক, হরেকৃষ্ণ ঠাকুর, দুর্গারাম দত্ত, গোবিন্দরাম (মিত্র ?) ।

৩· 'Dewan is the chief native officer of certain government establishments… or the native manager of a zemindary, or (in Bengal) a native servant in confidential charge of the dealings of a house of business with natives.'—*Hobson-Jobson.*

৪· *Foreign Department Miscellaneous Records*, S. No. 139 (1839(-এ এঁদের সকলকেই 'দেওয়ান' বলা হয়েছে । গোকুল ঘোষাল (মৃত্যু ১৭৭৯) বেনিয়ান ছিলেন, পাটনা কুঠির অধ্যক্ষ রামবোল্ডের অংশীদার ছিলেন ; নবকৃষ্ণ ছিলেন মুনশি, 'পলিটিকাল বেনিয়ান', মুনশিদপ্তর, জাত-কাছারি, খাজনাখানা, মাল-আদালতের অধ্যক্ষ ও সুতানুটির তালুকদার । এঁরা এবং রেকর্ডের তালিকার অনেকেই খাঁটি অর্থে দেওয়ান ছিলেন না, যদিও দেওয়ানির অর্থ অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ছিল ।

৫· তালিকাটি প্রস্তুত করেছিলেন রাধাকান্ত দেব ১৮২২ সালে পার্শিয়ান

সেক্রেটারি মিঃ এইচ· টি· প্রিনসেপের অনুরোধে। নামজাদা অনেক বংশকে (নিজের বংশসমেত) তিনিই দেওয়ানির গৌরবে গৌরবান্বিত করেছেন ; এ থেকে অনুমান কঠিন নয়, সেযুগের বনেদী বড় মানুষেরা দেওয়ানির গৌরব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তালিকায় রামমোহন রায়ের নাম নেই।

৬· 'Properly a term of respect,... and *formerly in some parts of Hindusthan applied to certain persons of distinction.*'—*Honson-Jobson.*

৭· হুতোম পেঁচার নক্‌শা, পৃ ১।

৮· কৃষ্ণজীবন শর্মা, বাণেশ্বর শর্মা, গৌরীকান্ত শর্মা—যে ৪ জন বিধান দিয়েছিলেন তাঁদের প্রথম ৩ জনকে কোম্পানির বেতনভোগী ১১ জন পণ্ডিতের তালিকায় দেখা যায়। 'Against these opinions Nuncoomar protested, and desired other pundits might be consulted at Nuddea, who were of a higher caste and better informed.'—H.E. Busteed : *Echoes from Old Calcutta, 1897, p. 70.*

৯· 159. Charities to Brahmins. (Consultations, October 27) 1755.—Rev. Long : *Unpublished Records etc.*

১০· হুতোম পেঁচার নক্‌শা, পৃ ২১-২২।

১১· '(Banamali Sarcar) owned the finest native house of the day.'—C. Sterndale : *An Historical Account of Calcutta Collectorate, 1959.*

সেকালের ছড়ায় : 'গোবিন্দরামের ছড়ি। জগৎ শেঠের কড়ি ॥
উমিচাঁদের দাড়ি। বনমালী সরকারের বাড়ি ॥'

১২· দ্রষ্টব্য : Dr. Pradip Sinha : *Social Changes—The History of Bengal (1757-1905,* C.U. pp. 388-89.

১৩· 354. Complaints from Black inhabitants of Gentoo Commissioners (Consultations, 3 July, 1758) ; 359. Names of those said to be favoured on account of their connections with the native Commissioners.—Rev. J. Long : *Unpublished Records etc.*

১৪· সেকালের ছড়া-গান : 'রাজা বলে গোকুল মিত্র শুনহে বচন। টাকা লয়ে দেও আমার মদনমোহন ॥ মিত্র বলে মহারাজ কোয়ালা দেখ আছে। বন্ধক নয় মদনমোহন বিক্রি হয়ে গেছে ॥' ; 'কারুর কিছু হারিয়েছে। বাগবাজারের মদনমোহন পালিয়েছে।'

১৫· 964. Nabakissen's Memorial (Select Committee, April 18, 1767)—Rev. J. Long : *Unpublished Recoords etc.*

১৬· ব্যাপারটায় এমন সোরগোল হয়েছিল যে ঢোলের একটা বোল তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যে-বোল ৮০-৮৫ বছর পরেও কলকাতার আসরে বাজত। 'এদিকে বারোয়ারিতলায় জমিদারি কবি আরম্ভ হলো, ভালকোর জগা ও নিমতের রামা ঢোলে 'মহিম্নস্তব' 'গঙ্গাবন্দনা' ও 'ভেটকি মাছের তিনখানা কাঁটা' 'অগ্‌গরদ্বীপের গোপীনাথ' 'যাবি তো যা যা ছুটে ছুটে যা' প্রভৃতি বোল বাজাতে লাগ্‌লো।'—হুতোম পেঁচার

নক্‌শা, পৃ ৩৯।

১৭· কলকাতার এই অভিনব দল ও দলাদলির সমর্থনে কৌতূহলজনক আলোচনার জন্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলিকাতা কমলালয় দ্রষ্টব্য।

১৮· অকায়স্থের কলকাতার কায়স্থসমাজে অনুপ্রবেশের অনেক কাহিনী আছে। একটি কৈবর্ত-পিতার বিভিন্ন সন্তানদের কায়স্থ বংশপরম্পরা স্থাপনের কৌতূহলোদ্দীপক একটি বিবরণ আছে সমাচার চন্দ্রিকায়।—সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ ২৭৪-৭৫। রানী রাসমণির শ্বশুর প্রীতিরাম মাড়ের আক্ষেপ সম্পর্কিত ছড়া : 'দুলোল হল সরকার অক্‌কুর হল দত্ত। আমি রইলাম যে কৈবর্ত সে কৈবর্ত।' সিমলার কায়স্থ-হওয়া এক দত্ত পরিবারের ঘটনা বলেছেন মহেন্দ্রনাথ দত্ত। এছাড়াও অন্য তথ্যের জন্যে দ্রষ্টব্য : কলিকাতার পুরাণ কাহিনী ও প্রথা, পৃ ১০১-২।

১৯· 'এই কলিকাতায় ব্রাহ্মণ দলপতি আছেন তাঁহারদিগের দলে কেবলই ব্রাহ্মণ ইহাতে কুলীন ও শ্রোত্রিয় ও বংশজ সকলেই আছেন। আর কোন জাতি নাই।'—কলিকাতা কমলালয়।

২০· দ্রষ্টব্য : প্রমথনাথ মল্লিক : কলিকাতার কথা, মধ্য খণ্ড ; রাধারমণ মিত্র : কলকাতার টুকিটাকি, এক্ষণ, শারদীয় ১৩৮২ ; গিরীশচন্দ্র ঘোষ : রামদুলাল দে, দ্য বেঙ্গলি মিলিওনেয়ার ; যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : সাধক কবি রামপ্রসাদ, পৃ ১৭৪-১৭৫ ; হরিহর শেঠ : প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়, পৃ ৫২২-২৩।

২১· ক্রমবর্ধমান সতীদাহের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় একটি দিক হচ্ছে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মধ্যে এই বীভৎস অনুষ্ঠানের প্রসার। ১৮১৮ সাল থেকে ১৮২৫ এর মধ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত ১৭টি সতীদাহের মধ্যে ১৪টি ব্রাহ্মণ পরিবারের এবং তার মধ্যে ১১টি ন্যায়রত্ন-তর্কালংকার-তর্কপঞ্চানন-ন্যায়বাগীশ পরিবারে। স্বল্পবিত্ত ও দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা কি এই সাড়ম্বর রক্ষণশীলতার লালিত মহিমার মোহগ্রস্ত শিকার হয়ে পড়েছিলেন? অন্যদিকে কৌতূহলজনক এই যে, নতুন বনেদী বড় মানুষেরা, যাঁরা এই রক্ষণশীলতার ধারক ও বাহক, যাঁদের বংশধররা পিতৃপিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সতীদাহের পক্ষ সমর্থনে তুলকালাম বাধিয়েছিলেন, তাঁদের বংশপঞ্জিতে সতীদাহের উল্লেখযোগ্য ঘটনা একেবারে নেই বললেই চলে (১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮২৪ সালে খিদিরপুরে গোকুল ঘোষালের দৌহিত্র-পত্নীর সহমরণের সংবাদ আছে)।

২২· '...রাজা নবকৃষ্ণ কবির বড় পেট্রন ছিলেন। ইংলণ্ডের কুইন এলিজাবেথের আমলে যেমন বড় বড় কবি ও গ্রন্থকর্ত্তা জন্মান, তেমনি তাঁর আমলেও সেই রকম রাম বসু, হরু, নিলু, রামপ্রসাদ ঠাকুর ও জগা প্রভৃতি বড় বড় কবিওয়ালা জন্মায়। তিনিই কবির মান বাড়ান, তাঁর অনুরোধে ও দ্যাখাদেখি অনেক বড়মানুষ কবিতে মাতলেন।'—হুতোম পেঁচার নক্‌শা, পৃ ৩৮।

২৩· উৎকোচ, অসাধুতা, অত্যাচার সব মিলিয়ে বিত্ত অর্জনের পদ্ধতি যে কতদূর হৃদয়হীন ছিল তার একটি দৃষ্টান্ত নিমকের দেওয়ানি। দ্বারকানাথের মতো 'হৃদয়বান' ব্যক্তিও সেই পদ্ধতিতেই প্রাথমিক বিত্ত

সংগ্রহ করেছেন। জীবনীকার লিখেছেন : 'তখন নিমক মহলের দেওয়ানী লইলেই লোকে দুইদিনেই ধনী হইয়া উঠিত। এইরূপে শহরের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ধনী হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথও কতিপয় বৎসরের মধ্যে ধনবান হইয়া বিষয় কার্য্য হইতে অপসৃত হন।' (শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯৫৭), পৃ ৬৬) কিন্তু আসলে দ্বারকানাথ নিমকের দেওয়ানি ছেড়েছিলেন তাঁর শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ফলে। 'ন্যূনাধিক দুই সহস্র' খালাড়ি, লর্ড বেন্টিংকের কাছে আবেদন করতে লাটভবনের সামনে উপস্থিত হয়ে 'দুঃখ ধ্বনি' করেছিল। বেন্টিংক গাড়ি করে বাইরে যাবার উদ্যোগ করলে 'খালাড়িরা তাঁহার গাড়ির নীচে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে চাহিয়াছিল'। যাত্রা স্থগিত রেখে বেন্টিংক সেক্রেটারিকে তাদের চারজন প্রতিনিধিকে ডেকে পাঠান। 'তাঁহারা ৫।৬ শত শরা সহিত বাহাদুরের সমীপে উপস্থিত হইলেন, গভর্ণর বাহাদুর ঐ সকল শরা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ সকল কেন আনিয়াছ ? উক্ত চারি ব্যক্তি কহিলেন, গভর্ণমেন্টের নির্দ্ধারিত আছে লবণ প্রস্তুত করিয়া ওজন দিলে খালাড়িরা প্রতি মোন লবণে দশ আনা মাত্র মূল্য পাইবে কিন্তু তাহারা প্রতি মোনে পাঁচ আনাও পায় না এবং ওজন মুখে ঠাকুর বাবুর জন্য প্রতি মোনে এক এক শরা লবণ রাখিতে হয়, গভর্ণমেন্ট প্রতি বৎসর লবণ প্রস্তুত করণীয় দাদনি টাকা অগ্রে দিয়া থাকেন খালাড়িরা তাহা দেখিতে পায় না, কর্ম্মচারীরা টাকা বদলে খালাড়িদিগের আহারীয় তণ্ডুল দেন, বাজারে যে সকল ধানি মোটা চাল মোন আট আনা দশ আনার অধিক নয় কিন্তু খালাড়িদিগের নিকট হইতে মোন মূল্য দেড় টাকা কাটিয়া রাখেন। খালাড়িরা অন্নবস্ত্র পায় না আহারাভাবে তাহারদিগের পরিবারাদির প্রাণবিয়োগ হইতেছে, লর্ড বাহাদুর খালাড়িদিগের এই সকল দুঃখের বিবরণ শ্রবণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন এ বিষয়ে উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন তৎপরে কালেক্টর প্লৌডিন সাহেব অবসর লইলেন এবং ঠাকুর বাবু সেরেস্তাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কারঠাকুর কোম্পানি নামে বাণিজ্যালয় স্থাপনের অনুষ্ঠান করিলেন।' দ্বারকানাথ নিমকের দেওয়ানি ছাড়েন ১৮৩৪ সালের আগস্টের শেষে। এই ঘটনার প্রায় ২২ বছর পরে বিবরণটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ সালের ৯ আগস্ট 'সম্বাদ ভাস্কর', ৫২ সংখ্যায়, কলকাতার খালগুলোয় 'মেং গিরিপ সাহেবের' আরোপিত বিধিনিষেধের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লর্ড ক্যানিংয়ের কাছে স্থানীয় মহাজনদের 'গভর্ণমেন্ট হৌসের পশ্চিম দ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া' 'দুইঘণ্টাকাল চীৎকার করিয়া... আপনারদিগের দুঃখ' জানাবার প্রসঙ্গে। (দ্রষ্টব্য বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড, পৃ ৩১৮-১৯)। সমকালীন ইংরেজি ও বাংলা কোনো পত্রিকায় সংবাদটি প্রকাশিত হয় নি, তার কারণ দ্বারকানাথের ব্যক্তিগত প্রভাব। 'শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলিশমেন কাগজের প্রোপাইটার', 'হিরাল্ড নামক কাগজ সর্জনকর্ত্তা তিনি এই ক্ষণে বাঙ্গাল হরকরা মধ্যে প্রবিষ্ট অপর ইণ্ডিয়া গেজেট নামক পত্র এবং সে আফিস ঠাকুর বাবু ক্রয় করিয়া হরকরার শামিল করিয়া দিয়াছেন', 'বঙ্গদূত শ্রীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর সুধাকর ঠাকুর বাবুদিগের অধীনে,'—সুতরাং দ্বারকানাথের অপক্ষপাতী কোনো সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশের উপায় নেই ; এই তথ্য

দিয়ে ১৮৩৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সমাচার চন্দ্রিকা সহযোগী সমাচার দর্পণকে পক্ষপাতিত্বের যে অভিযোগ করেছিল তাতে এই ঘটনার স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল : 'অপর দর্পণকার যে ঠাকুর পক্ষে আছেন তাঁহার মতের বিপরীত কথা কি তিনি লিখিয়া থাকেন কিম্বা নমক ব্যাপারিগণের বিপক্ষ দর্পণকার ইহা ব্যক্ত হইয়াছে এই ক্ষণে ঐ নমক ব্যাপারিরা যে রোদন করিতেছে তাহা দর্পণে অর্পণ হইয়া থাকে...' তারপর নিমকের দেওয়ানি নেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর। (সমাচার চন্দ্রিকা, ১৪ অক্টোবর, ১৮৩৪)। 'বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের পর টরেন্স সাহেবের আমলে নীলরত্ন (হালদার) সল্ট বোর্ডের দেওয়ান হইয়াছিলেন।'—রাজনারায়ণ বসু : সে কাল আর এ কাল, পৃ ৭০। প্রসন্নকুমার দ্বারকানাথের জ্ঞাতি, নীলরত্ন দ্বারকানাথের 'বঙ্গদূত' পত্রিকার সম্পাদক। নিমক দেওয়ানি ছাড়লেও দ্বারকানাথের স্বশ্রেণীর মধ্যে, তা থেকে গিয়েছিল।

২৪. হরিহর শেঠ : প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়, পৃ ৪১৯। বাঙালী বেনিয়ানবাবুর (দুর্গাচরণ মুখার্জি ?) ইংরেজিজ্ঞান-দ্রষ্টব্য।

২৫. বিনয় ঘোষ : সুতানুটি সমাচার (হিকির আত্মকথা)। 'What they could not express by words was indicated by signs ; and thus many a native contrived by supplementing the inadequecy of his expression with the gesticulations of his body, to make himself intelligible to his European master with no ampler philological resources than the scanty stock of four words 'yes' 'no' 'very well.'—Ramcomul Sen: *English-Bengali Dictionary*, 1834, Intorduction দ্রষ্টব্য। রাজনারায়ণ বসু : সে কাল আর এ কাল, ১৩৫৮, পৃ ২৬-২৭। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ ৭৪-৭৫।

২৬. এই অবজ্ঞার পূর্ণ বিকশিত রূপের দৃষ্টান্ত হিশাবে পার্সিভাল স্পিয়ার শ্রীমতী ফেনটনের একটি অকরুণ মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। রূপলাল মল্লিকের বাড়িতে নাচের আসর দেখে শ্রীমতী ফেনটন স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন :'... the natives consider it a great addition to their importance to have European guests. The poor animal who exists on rice and ghee all the year, contended with a mat for his bed, here may be seen playing the liberal entertainer.'—Percival Spear: *The Nabobs (1963), pp. 141* . নাচের এক আসর সম্পর্কে ১৮২৫ সালে ১৭ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার ক্যালকাটা গেজেটে রূপলাল মল্লিক বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন : 'There will be an English band, Nautches, &c. in a style superior to everything of the kind before given in this settlement. অনুমান করি, এই নাচের আসরেই শ্রীমতী ফেনটন আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

২৭. প্রতিবাদীদের মধ্যে শিক্ষিত অভিজাত বংশের যাঁরা ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন, তেলিনিপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, টাকির কালীনাথ রায়, ভূকৈলাশের কালীশংকর ঘোষাল, আন্দুলের রাজা কাশীনাথ প্রভৃতি। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পিতা গোপীমোহন ঠাকুরের (দ্বিতীয় পুরুষ) নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাধাকান্ত দেব ছিলেন রক্ষণশীল দলের মুখপাত্র।
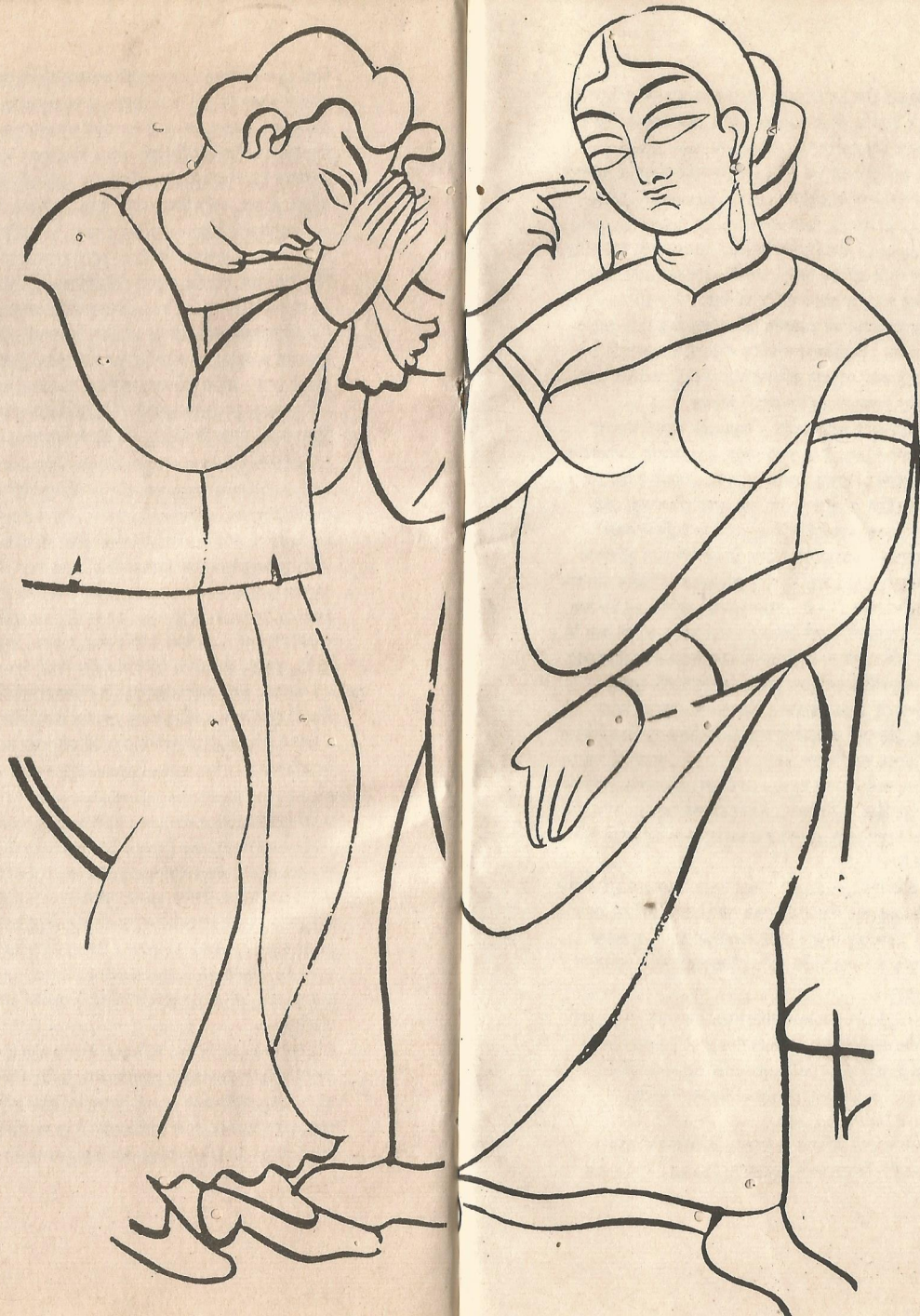
২৮· বাঙালী অভিজাতরা বেশভূষার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল ছিলেন। যখন সবকিছুতে ইংরেজি রুচির অনুকরণ চলছে সে সময়কার উল্লেখ করে বিশপ হেবার মন্তব্য করেছেন : 'None of them adopt our dress...' প্রায় ৫০ বছর আগেও ১৭৭৯ সালে ম্যাকিনটশও এ ব্যাপারে রক্ষণশীল মনোভাব লক্ষ করেছিলেন (দ্রষ্টব্য Mackintosh: *Travels in Europe, Asia and Africa*, Selections from Calcutta Gazette, Vol. V., Append.)। বাঙালী হিন্দু অভিজাতদের পোশাকী ক্যাটগৌরে পোশাক সম্পূর্ণ পৃথক জাতের ছিল, পোশাকী বেশেরও ভিন্নতা ছিল। পোশাকী বেশের প্রথম সংস্কারক রামমোহন রায়। 'তাঁহার সময় পরিচ্ছদ বিষয়ে মুসলমানদের অনুকরণ চলিতেছিল কিন্তু তিনি তাহার পরিবর্ত করিয়া যান। খিড়কিদার পাগড়ীর পরিবর্তে বাঁধা পাগড়ী এবং ঘাঘড়ার পরিবর্তে কাবা পরিধান করিবার নিয়ম তিনিই প্রবর্ত্তিত করেন। উক্ত কাবা এক্ষণে পাচকানে (? চাপকানে) পরিণত হইয়াছে।'—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : 'রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১৮০০ শক, ৪১৮ সংখ্যা। সামাজিক সমাবেশে ইয়োরোপীয় বেশের সাক্ষাৎ মেলে না। 'একটি আমোদের সভায় উপস্থিত হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ ধুতি চাদর, কেহ উষ্ণীষ চাপকান, কেহ মোগলাই পরিচ্ছদ, কেহ বা ইহুদি পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন।... আমাদের এক্ষণে অনেক পরিমাণে দুইপ্রকার পরিচ্ছদ দাঁড়াইয়াছে; ধুতি প্রভৃতি বাটীর পরিচ্ছদ আর উষ্ণীষ চাপকান বাহিরে যাইবার পরিচ্ছদ।'—ঐ : স্বদেশানুরাগ : আশ্বিন, ১৭৯৮ শক, ৩৯৮ সংখ্যা। ইয়োরোপীয় বেশ শিক্ষিত মহলে সহজে প্রবেশ করে নি। ইয়ং বেঙ্গলরা অধিকাংশই অ-ইয়োরোপীয় বেশ পরতেন; মাইকেলের কথা স্বতন্ত্র। অনুকারী নব্যবাবুদের একাংশ অবশ্যই 'বুট, কোট, পেন্টালুন... টুপ্যাবৃত মস্তক' ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো সিভিলিয়ান ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা পরতেন, শিক্ষিত সম্পন্ন ব্যক্তিরাও মাঝে মধ্যে (বিশেষ করে বিদেশ ভ্রমণে ?) পরতেন; সূর্যমুখীর সন্ধানে নগেন্দ্রনাথ যখন কাশী-ফেরত মধুপুরে (রানীগঞ্জ) যান তখন 'পেন্টুলন পরা, টুপি মাথায় ছিল'। (বিষবৃক্ষ : সপ্ততিতম পরিচ্ছেদ)। শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে ইয়োরোপীয় বেশের শ্লথ অনুপ্রবেশের বড় কারণ ছিল স্বাদেশিকতার উদ্বোধ।

২৯· ঈশ্বর গুপ্ত : কবিজীবনী, পৃ ১৪৬। 'সকার বকার' এমনই মাত্রাহীন ছিল যে হরু ঠাকুর নবকৃষ্ণের পুত্র রাজকৃষ্ণের পৃষ্ঠপুষ্ট হতে লজ্জিত বোধ করেছিলেন : 'মহাশয়ের পিতার নিকট লজ্জাশূন্য হইয়া যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছি আপনার নিকট কদাচ সে প্রকার করিতে পারিব না।' (ঐ পৃ ১৪৮-১৪৯)

৩০· 'Thesere is evidence to show that from the end of the 18th to the middle of the 19th century this prolifc literature, outrageous as it is to all taste, obtained considerable favour and currency.' S. K. De : *Bengali Literature in the Nineteenth Century, pp. 369.*

৩১· বিশপ হেবরের পূর্বোক্ত উক্তি ও এ সংক্রান্ত আলোচনা—দ্রষ্টব্য : রমাকান্ত চক্রবর্তী : বিস্মৃত দর্পণ, অবতারণা (১৯৭০), পৃ ২৯-৩০।

৩২· 'বাড়ির ভিতর সুন্দর ও মূল্যবান আসবাবপত্রে সাজানো, এবং সবই ইউরোপীয় স্টাইলে, কেবল বাড়ির মালিক হলেন বাঙালীবাবু (রামমোহন রায়)।'—বিনয় ঘোষ : ভ্রমণবৃত্তান্ত। ফ্যানি পার্কস : কলিকাতা শহরের ইতিবৃত্ত (১৯৭৫), পৃ ২৩২।

৩৩· শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ইত্যাদি, পৃ ৮৬।

৩৪· বিনয় ঘোষ : ভ্রমণবৃত্তান্ত। ফ্যানি পার্কস ইত্যাদি, পৃ ২৩১-২৩২।

৩৫ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃ ১৩৮-৩৯।

৩৬· দ্রষ্টব্য, রমাকান্ত চক্রবর্তী : বিস্মৃত দর্পণ : অবতারণা, পৃ ৯, ২৭-২৮।

৩৭· হরিহর শেঠ : প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়, পৃ ৫৮১। তিনি আটজন বাবুর নাম করেছেন।

৩৮· প্রাণকৃষ্ণ হালদারের নোট দিয়ে চুরুট ধরানো, কড়াপাকের সন্দেশ দিয়ে স্নানাগার নির্মাণ, ঝাড় লণ্ঠন ভেঙে শব্দবৈচিত্র্য অনুধাবনের প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিষয়ে জ্যোতির্ময় ঘোষের (ভাস্কর) লিখিত সতীশ মিত্র : হুগলি জেলার ইতিহাস, ১ম খণ্ডে উল্লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩৯· 'একটি জিনিষ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার, সেটি হইতেছে তাঁহার সৌন্দর্যভোগের অসীম ক্ষমতা। যে বিলাসিতা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তা তাঁহার বেলগাছিয়া বাগানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাই উত্তরকালে বংশধরদের মধ্যে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে।' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড (১৩৫৩), পৃ ৬।

৪০· কলিকাতা কমলালয়।

৪১· নববাবুবিলাস, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ৭, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস (১৩৪৪), প্রথম প্রকাশ ১৮২৩ পৃ ৯।

৪২· লক্ষণীয় যে এই 'অনেক পন্থার' মধ্যে বনেদী দেওয়ানি-বেনিয়ানি-মুৎসুদ্দি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত নয়। এঁরা অর্থ করেছেন,-'স্বর্ণকার বর্ণকার কর্ম্মকার পটকার মঠকার বেতনোপভুক হইয়া কিম্বা রাজের সাজের কাঠের খাটের মঠের ইটের সরদারি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা অগম্যাগমন মিথ্যাবচন পরকীয়রমণীসংঘটনকামী ভাড়ামী রাস্তাবন্দ দাস্য দৌত্য গীতবাদ্যতৎপর হইয়া কিম্বা পৌরোহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরুশিষ্য ভাবে।' (ঐ, পৃ ১০)। অর্থাৎ নববাবুরা জন্মসূত্রেই অবিশুদ্ধ নিম্নবর্ণের।

৪৩· সংস্কৃত শ্লোকটি অতিবিখ্যাত : 'অবতু বা গিরিসুতা শশিভৃতা প্রিয়তমা। বসতু মে হৃদি সদা ভগবতঃ পদযুগং ॥' গুরু মহাশয় যেমন জানেন, তেমনই এটি শিখিয়েছেন : 'অবু তবু গিরিসুত মায় বলে পড় পুত পড়িলে শুনিলে দুধিভাতি না পড়িতে ঠেঙ্গার গুঁতি।'

৪৪· অন্য পাঠ : 'ঘুড়ী তুড়ী জস দান আখড়া বুলবুলি মনিয়া গান। অষ্টাহ বন ভোজন এই নবধা বাবুর লক্ষণ।'—বাবুর উপাখ্যান, সমাচার দর্পণ, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮২১। প্রায় ৬৫ বছর পরে বিবর্তিত বাবুর লক্ষণ : 'সুধু বাবু হয় নাই আটটি লক্ষণ চাই/তবে নাম জানিবে সকলে ॥ বেশ্যাবাড়ি ছড়িঘড়ি বিকেলে ফিটন গাড়ি/দিবানিশি ভাস লাল জলে ॥ গান বাদ্য কর সার মাছ ধর রবিবার/চুল কাট আলবার্ট ফ্যাসনে ॥'—প্রিয়নাথ পালিত : টাইটেল দর্পণ (১৮৮৫)।

৪৫· সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃ ১০৮-১১৪ ; ১১৫-১১৬,

১২৩-১২৪, ১২৮ ।

৪৬· আলালের ঘরের দুলাল সমালোচনা প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্র লেখেন : 'ঐ প্রবন্ধের আদর্শ নববাবুবিলাস' ; এবং নববাবুবিলাসের নববাবু সম্পর্কে বলেন : 'যে সময়ে তাহা প্রস্তুত হইয়াছিল তৎকালে বর্ণিত বাবুর আদর্শ কলিকাতায় অপ্রাপ্য ছিল না ।'—বিবিধার্থ-সংগ্রহ (শকাব্দ ১৭৮০, চৈত্র) ।

৪৭· রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ ৫৬ ।

৪৮· ফার্সির 'কাফ আয়েন গায়েন' উচ্চারণ শিখতে শিখতেই মতিলাল মুনশি সাহেবের দাড়িতে টিকের আগুন দিয়ে তাড়িয়েছিল ।

৪৯· আলালের ঘরের দুলাল, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (২য় সং) পৃ ৫৮ ।

৫০· 'কিন্তু ডিরোজিওর শিষ্যদিগকে একটি বিষয়ে অত্যন্ত প্রশংসা করিতে হয়, তাঁহারা রাজকার্য্যে উৎকোচ গ্রহণ না করার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন ।'—রাজনারায়ণ বসু : সে কাল আর এ কাল', ১ম সা· প· সং, পৃ ৩৫ ।

৫১· ১৮৫৬ সালে ইয়ং বেঙ্গল সম্পর্কে 'সম্বাদ ভাস্কর'-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য : '··· হিন্দু কালেজের প্রথমাবস্থায় যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষা করিয়া বাহির হইয়াছিলেন তাঁহারা কিছুকাল মদ্য মাংস ধ্বংস করিয়া তেজস্বিত্ব দেখাইয়াছেন এইক্ষণে জুজু হইয়া বসিয়াছেন আর তাঁহারদিগের সে প্রতিভা দেখিতে পাই না,··· তাঁহারা কি ইংরাজ কি বাঙ্গালি কি হিন্দু মোগলাদি কোনো শ্রেণীতেই মিশ্রিত হন না, যেন স্বতন্ত্র এক শ্রেণী হইয়া রহিয়াছেন···' ।

৫২· বিনয় ঘোষ : বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৯৬৮), পৃ ১৯২ ।

৫৩· সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, পৃ ৬৪ ।

৫৪· ঐ, পৃ ৩৩ ।

৫৫· ঐ, পৃ ২৩১-২৩৩ ।

৫৬· রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ ৮৬ । সুরাপান করে 'শাস্ত্র ও লোকাচারের বাধা অতিক্রম' করার একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত : 'যেদিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি, সে দিন বিস্কুট ও সেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করা হয় । জাতিবিভেদ আমরা মানি না, উহা দেখাইবার জন্য ঐরূপ করা হয় । খানা খাওয়া ও মদ্যপান করার রীতির জের রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদিগের সময় পর্য্যন্ত টানিয়াছিল ; কিন্তু সকলেই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের দিন ঐরূপ করিতেন তাহা নহে ।'—রাজনারায়ণ বসু : আত্মচরিত, পৃ ৪৬ ।

৫৭· নববাবুবিলাস, পৃ ৩৫ ।

৫৮· 'জলেশ্বরের ধোলাই ধুতি পরিয়া মদিরা সহযোগে খানার শেষে কুরসিতে বসিয়া সালমউতে মাখা তামাক টানিতে টানিতে (রাঢ় অঞ্চলের গ্রামের ধনীরা) আফিঙ্গের মৌতাতে গুমোট বরষায় ঝিমাইতেছেন, এই চিত্র দুর্লভ নহে ।'—পঞ্চানন মণ্ডল : চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ (১৯৬৮), পৃ ২০১ ।

৫৯· 'মাদক দ্রব্যের কর সংগ্রহ জন্য নিযুক্ত কর্ম্মচারিরা অধিক ধনাগম করিতে পারিলেই রাজ পুরুষদিগের নিকটে প্রতিপন্ন হয়েন, এ প্রযুক্ত স্বীয় অধিকারে মদ্যাদির অধিক বিপনী স্থাপন দ্বারা অধিক কর সংগ্রহ জন্য

একান্ততঃ যত্ন হয় । ইহাতে মাদক দ্রব্যের বাণিজ্য বৃদ্ধির সহিত এতন্নগরস্থ লোকেরা ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইতেছে ।'—কলিকাতার বর্ত্তমান দুরবস্থা । তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১ শ্রাবণ ১৭৬৮ শক, ৩৬ সংখ্যা । দ্রষ্টব্য : সুরাপান । কার্তিক ১৭৭৪ শক । ১১১ সংখ্যা ।

৬০· 'গোমাংসের নাম শ্রবণে শ্রবণ পিধান করেন এমত অনেক দক্ষিণাচারি বাবুরদিগের দেখিয়াছি তবে কি নিমিত্ত তাঁহারা দুর্গার্চন বাটীতে বিফষ্টেক ও মটন চপ ও বৎস মাংস ও ব্রাণ্ডি সাম্পেন সেরি ইত্যাদি নানা প্রকার মদিরা আনয়ন করেন ।'—সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ ২৬৬ ।

৬১· 'THURSDAY, SEPTEMBER 20, 1827/GRAND NAUCHES/ Doorga Pooja Holidays/BABOO PRANKISSEN HOLDAR/of Chinsurah... Baboo Pran Kissen Holdar further begs to say, that every attention and respect will be paid to the Ladies and Gentlemen who will favour him with their Company, and that he will be happy to furnish them with Tiffin, Dinner' Wines, &c., during their stay there/PRANKISSEN HOLDAR/Chinsurah, September 14, 1828.'—*The Days of John Company, pp. 258.*

৬২· রামমোহন রায়ের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ : 'Hindu authorities in favour of slaying the Cow amd eating its flesh'. দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : রামমোহন রায়, ৩য় সং, পৃ ১০২ ।

৬৩· রাজনারায়ণ বসু : আত্মচরিত ।

৬৪· সে কাল আর এ কাল, পৃ ৭৮ ।

৬৫· চাহিদার অন্যতম কারণ—বাল্যবিবাহ, অশিক্ষিত স্ত্রী ও প্রাচীন গৃহপরিবেশ । প্রহসনের একটি চরিত্রের উক্তি : 'ভাই ঘরে যে ঠাকরুণ আছেন, তার না আছে কথার ছেনালী, না আছে পোষাকের বিউটী, না আছে গাওনা বাজনার টেষ্ট ।··· ওয়াইফের সঙ্গে তাদের আমোদ-প্রমোদ করা দূরে থাক, একবার দেখাবার যো নেই ।'—হরিশ্চন্দ্র মিত্র : ঘর থাক্তে বাবুই ভেজে (১৮৭২) । যোগানের অন্যতম কারণ : 'বিধবা-বিবাহ-প্রতিষেধ ও বল্লাল-প্রতিষ্ঠিত কৌলীন্য মর্য্যাদা এই দুই রীতি এতদ্দেশে ধর্ম্ম-পথের কণ্টক স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে । তদ্দ্বারা বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে··· ঐ দুই প্রথার প্রভাবে, কলিকাতা নগরী বেশ্যা-সমূহে পূর্ণ হইতেছে ।'—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা : বিধবাবিবাহ, চৈত্র ১৭৭৬ শক, ১৪০ সংখ্যা । দ্রষ্টব্য, এ দেশীয় স্ত্রীলোকের ব্যভিচারের কারণ : বিদ্যাদর্শন, কার্তিক ১৭৬৪ শক, ৫ সংখ্যা ।

৬৬· 'শহর কলিকাতায় নিকী নামে এক প্রধান নর্ত্তকী ছিল কোন ভাগ্যবান তাহার গান শুনিয়া ও নৃত্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এক হাজার টাকা মাসে বেতন দিয়া তাহাকে চাকর রাখিয়াছেন ।'—সমাচার দর্পণ, ১৬ অক্টোবর, ১৮১৯ ।

৬৭· দ্রষ্টব্য, হুতোম প্যাঁচার নক্শা, পৃ ৮৯-৯০ ।

৬৮· 'You often meet a blustering fellow dashing forward in a phaetion or buggy, shaking you by the hand, pouring forth a torent of English words without regrad to Lindley Murry,

eating beef-steaks with you at your table and drinking your health now and then perhaps making amour to your wife or daughter.'—Yound Bengal : Selections from the Writings of Grish Chunder Ghose, 1912, pp. 121. নববাবুদের কৌশল ছিল অপেক্ষাকৃত স্থূল : 'বাবুর নিকটে যদি কোনো লোক আসিয়া কহে যে অমুক লোক এই প্রকার দায়গ্রস্ত। বাবু তৎক্ষণাৎ গাড়ী আরোহণ করিয়া তাহার বাটীতে গিয়া কহেন যে এ তোমার কোন দায় আমি সকল উদ্ধার করিব কিন্তু এইক্ষণে কিছুদিন অস্পষ্ট থাকহ আর বৈঠকখানায় কেন বসিয়াছ বাটীর ভিতর চল সেইখানেই পরামর্শ করিব। বাটীর ভিতর গিয়া মিথ্যা আশ্বাস বাক্যে আকাশের চন্দ্র হাতে দিয়া স্ত্রীলোক কোন দিকে থাকে তাহার অনুসন্ধান করেন ঐ চেষ্টাতে প্রত্যহ যাতায়াত করেন।'—বাবুর উপাখ্যান, ২য় পরিচ্ছেদ : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, পৃ ১১৩।

৬৯. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ ৩১৬। ১৮৭২ সালে রামতনুর বয়স ৫৯, প্যারীচাঁদের ৫৮।

৭০. মধুসূদন গ্রন্থাবলী, সাহিত্য সংসদ সং, ১৯৭৪, পৃ ২৪২।

৭১. দ্রষ্টব্য কলিকাতার বর্তমান দুরবস্থা : তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা : ১ শ্রাবণ ১৭৬৮ শক, ৩৬ সংখ্যা ; সুরাপান : ঐ, কার্তিক ১৭৭৪ শক, ১১১ সংখ্যা। সংবাদ প্রভাকর : সম্পাদকীয়, ২৫ মে ১৮৫৭। সুরাপান ও দলাদলি : সোমপ্রকাশ, ২৬ বৈশাখ, ১২৭৮ সন, ২৫ সংখ্যা ; বাঙ্গালা দেশের একটি শোচনীয় অবস্থা, ঐ, ১ শ্রাবণ ১২৭৯ সন, ৩৫ সংখ্যা ইত্যাদি।

৭২. '...অসৈরণ সৈতে নারি শিকেয় বসে ঝুলে মরি', সং—অসৈরণ সইতে নারি মহাশয়, ইয়ং বাঙ্গালদের টেবিলে খাওয়া, পেন্টুলন ও (ভয়ানক গরমিতেও) বনাতের বিলাতী বনাতের কট, চাপকান পরা! (বিলক্ষণ দেখতে পান) অথচ নাকে চসমা! রাত্তিরে খানায় পড়ে ছুঁচো খান! দিনের ব্যালা রিফর্মেশনের স্পিচ করেন দেখে—শিকেয় ঝুলচেন।'—হুতোম প্যাঁচার নকশা, পৃ ২৬। নামে ইয়ং বেঙ্গল হলেও এটি নব্যবাবুর রূপ ভেদ, প্রকৃত ইয়ং বেঙ্গলদের সঙ্গে পার্থক্য দেখিয়েও গিরীশচন্দ্র ঘোষ এটির ইয়ং বেঙ্গলই নাম রেখেছেন।

৭৩. '—বাবুর ট্যাস্‌ল দেওয়া টুপি, পাইনাপেলের চাপকান, পেটি ও সিল্কের রুমাল, গলার চুলের গার্ডচেন অথচ থাকবার ঘর নেই, মাসীর বাড়ি অন্ন ল্সেন, ঠাকুরবাড়ি শোন, আর সেনদের বাড়ি বস্‌বার আড্ডা। পেট ভরে জল খাবার পয়সা নাই, অথচ দেশে রিফর্ম্মেশনের জন্যে রাত্তিরে ঘুম হয় না। (মশারির অভাবও ঘুম না হবার একটি প্রধান কারণ)। পুলিস, বড় আদালত, টালার নিলেম, ছোট আদালতে দিনের ব্যালা ঘুরে বেড়ান, সন্ধ্যে ব্যালা ব্রহ্মসভায় মিটিং ও ক্লবে হাঁফ ছাড়েন—গোয়েন্দাগিরি, দালালি, খোসামুদি ও ঠিকে রাইটরি করে যা পান, ট্যাসলওয়ালা টুপি ও পাইনাপেলের চাপকান রিপু কত্তে ও জুতো বুরুসেই সব ফুরিয়ে যায়! সুতরাং সিকি মাইনের স্কুলমাস্টারি কখন কখন স্বীকার কত্তে হয়।'—ঐ, পৃ ২৬।

৭৪. ব্রাহ্মবাবুদের বিস্তারিত বর্ণনার জন্যে দ্রষ্টব্য, নিশাচর : সমাজ কুচিত্র ও পল্লীগ্রাম তীর্থ, হুতোম পেঁচার নকশ ও অন্যান্য সমাজচিত্র, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং।

৭৫. 'Dr. Tonnene, Homeopathic Physician in Calcutta has recovered Rs. 5310/-for attendence on the millionaire Ashutosh Dev... The Court decreed that Dr. Tonnene was entitled to a gold mohur for every visit at the Babu's residence and Rs. 50/-for every visit to Pannehati.'—*Eriend of India, 31 July 1856.*।

৭৬. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১ শ্রাবণ ১৭৬৮ শক, ৩৬ সংখ্যা।

৭৭. পাশের সংখ্যার হিশাবের জন্যে দ্রষ্টব্য, বিনয় ঘোষ : বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, পৃ ২০৯-২১০।

৭৮. মনোমোহন বসু সম্পাদিত : মধ্যস্থ (মাসিক), চৈত্র, ১২৮০।

৭৯. ধুতির উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়, কিন্তু টুপির অনুল্লেখে তার অপ্রচলন বুঝতে হবে, টুপির (সায়েবী নয়) অপ্রচলনের কারণ চুলের নতুন নতুন কায়দা। 'ফিরানো চুল' ওয়েল্‌সী ফ্যাসন, এর আগের ফ্যাসন ছিল আলবার্ট। 'কুইন ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস মস্তকের মধ্যভাগ হইতে ঘাড় পর্যন্ত স্ত্রীলোকের সিঁতির ন্যায় চুল ফিরোন। রাজকুমারের পিতা প্রিন্স আলবার্ট বাঁকা সিঁতি কাটিতেন। পিতাপুত্রের চুল ফিরোনোর অনুকরণকে আলবার্ট ফ্যাশান ও ওয়েল্‌সী ফ্যাশান বলে।'—নিশাচর : সরস্বতী পূজা, পৃ ১৫৮।

৮০. এখানে টুপির (সাহেবী) অনুল্লেখ অনবধানবশত। 'এ মত সময়ে দৈবযোগে বুট, কোট, পেন্টালুন, চেন, চসমা, চুরুট, চাবুকধারী টুপ্যাবৃতমস্তক এক নব্য বাবু তথায় উপস্থিত।'—বঙ্কিমচন্দ্র : হনুমদ্বাবুসংবাদ (লোকরহস্য)। চসমা ও চাপ দাড়ি ছিল ব্রাহ্মবাবুত্বের প্রতীক। ফিকিরচাঁদ বাউলের ছড়া-গান 'যত দেড়ে চেলার আজব খেলা/পদ্মকুঁড়েয় বদরতলে ॥ চোখে ধুলি সরল বুলি/মাথায় টেরী টিকির ছলে।'

৮১. বেশ্যার জার—ব্যবহারিক শব্দকোষ ; বাঁধাবাবু—বেশ্যার বাঁধা খদ্দের।—অপরাধজগতের শব্দকোষ : ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক।

৮২. বস্তুনিষ্ঠভাবে এই অখণ্ড বাবুর অষ্টধা লক্ষণ স্থির করার চেষ্টা হয়েছে এইভাবে :

১) বাবু দেহে দুর্বল, মনে ভীরু, বুদ্ধিবৃত্তিতে কল্পনাপ্রবণ ; ২) বাবুর শিক্ষা পল্লবগ্রাহী ; ৩) বুদ্ধিবৃত্তিতে সৃজনীশক্তির অভাব ; ৪) বিদেশী শিক্ষার ফলে পুরোপুরি বিদেশীভাবাপন্ন ; এই শিক্ষায় কেবলমাত্র মনের কল্পনাশক্তিই বেড়েছে, অন্যান্য সহদ্বৃত্তিগুলো পেছনে পড়ে গেছে ; ৫) বাবু জাতীয় স্বভাবের প্রশান্তি ও কোমলতা হারিয়েছেন, রূঢ়, অহংকারী ও গায়ে-পড়া স্বভাবের হয়েছেন ; ৬) ইংরেজির প্রতি ভক্তি, মাতৃভাষার প্রতি অতি অভক্তি ; ৭) শাসকশ্রেণীর প্রতি বিরুদ্ধতা(antagonism) এবং কল্পিত (supposed) অকৃতজ্ঞতার জন্যে বাবু অবজ্ঞামিশ্রিত ঘৃণার জন্মদাতা ও তীব্র ভাষায় বারংবার তিরস্কৃত ; ৮) বাবু সর্বদা অসন্তুষ্ট, বিক্ষোভসৃষ্টিকারী, ইংরেজশাসনের প্রতি অসদয়, সংবাদপত্রে লেখনির মাধ্যমে ও সভায় জ্বালাময়ী বক্তৃতায় গাত্রজ্বালা প্রকাশে অভ্যস্ত।—The Babu : A Hindusthani : *Bengal Magazine, April 1874*

৮৩. বাবু : লোকরহস্য (১৮৭২)।

৮৪. ঐ।

৮৫. এইসব গুণাবলির ভিত্তিতে ব্যঙ্গ-রসিকের বাবু শব্দের ব্যুৎপত্তিনির্দেশ : 'বাবু—বব চাঞ্চল্যে, বৃথা অভিমানে, পরানুকরণে, ধৃষ্ট ব্যবহারে চ । ঔনাসিক ণুঃ প্রত্যয়ঃ । ণ ইৎ যায়, উ থাকে, অ-কারের বৃদ্ধি । যাহাদিগের স্বভাব চঞ্চল, অভিমান গগনস্পর্শী, চিত্ত পরানুকরণরত এবং ব্যবহার ধৃষ্ট, তাহারা বাবু ।'—বান্ধব, আশ্বিন-কার্তিক, ১২৮১ সন ।

৮৬. দ্রষ্টব্য *Hobson-Jobson.*

৮৭. দ্রষ্টব্য : ড. জয়ন্ত গোস্বামী : সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর প্রহসন ।

৮৮. 'না, নগেন্দ্র ! তুমি মরিলে সূর্য্যমুখী বাঁচিবে না, কিন্তু তোমার মরাই ভাল ছিল ।'—বিষবৃক্ষ, একবিংশ পরিচ্ছেদ ।

৮৯. বঙ্গদর্শন ও প্রথম তিন সংস্করণ কৃষ্ণকান্তের উইল দ্রষ্টব্য ।